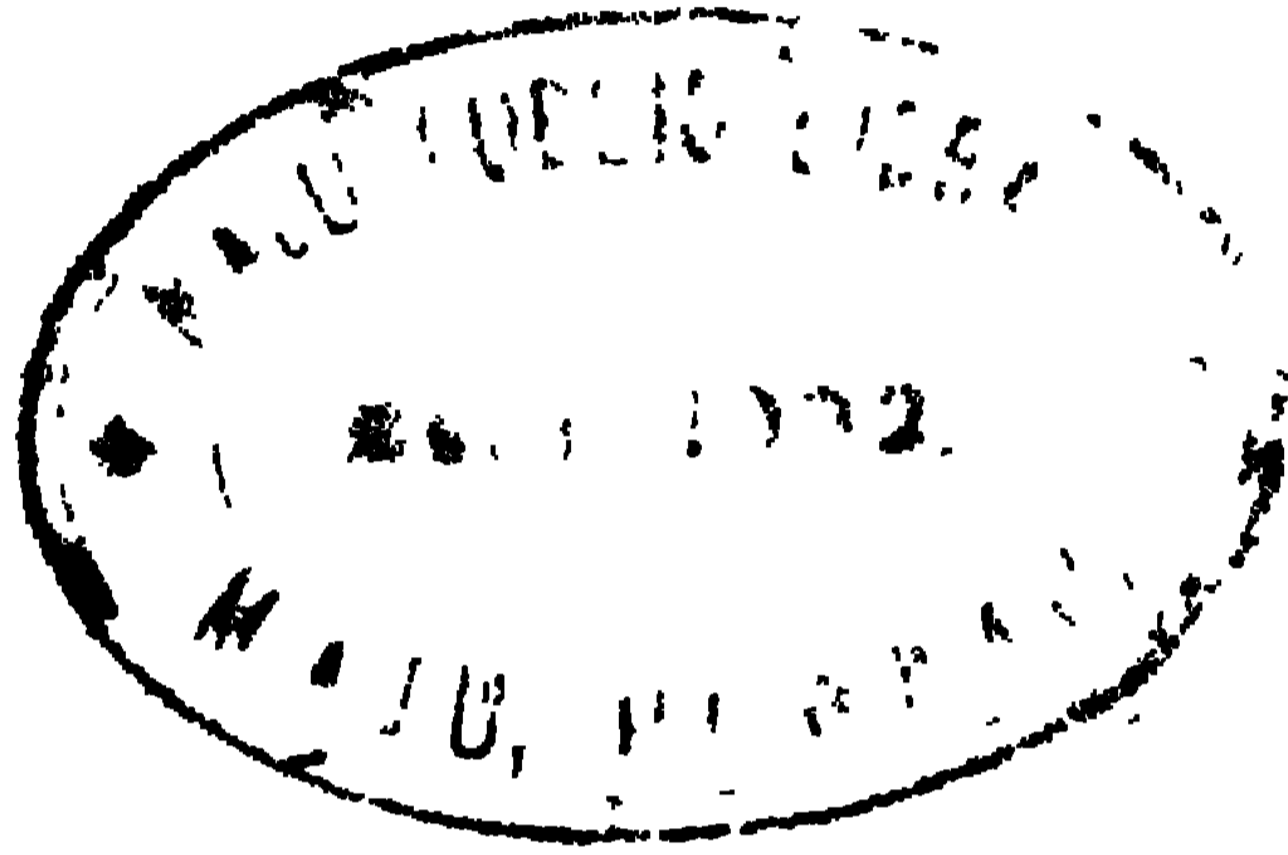


আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থালার অষ্টাদশ গ্রন্থ

নকল পাঞ্জাবী



শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রাবণ, ১৩২৪

PUBLISHED BY
GURUDAS CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, Cornwallis street, Calcutta.



PRINTED BY
RADHASYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS.
2, Goabagan Street, Calcutt

10/10/10

.....

.....

.

.....

.....

.....

.....

নকল পাঞ্জাবী

প্রথম প্রস্তাব

১

পঞ্চনদ ভূমি পাঞ্জাবের মোহিনী, গঙ্গার শতমুখ-
চূষিত বঙ্গের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণকারিণী কি না, জানি
না। শান্ত স্নিগ্ধ ঢল ঢল অশ্রুসিক্ত বঙ্গের প্রকৃতি এবং রুদ্র
কঠোর বীরগর্বে প্রদীপ্ত পঞ্চনদের পরুষ পুরুষত্ব—উভয়ের
ঘন্ডে কে হারে কে জেতে, একটা দেখিবার বিষয় বটে।

বঙ্গের কোল ছাড়িয়া পাঞ্জাবের ক্রোড়ে আসিতে
অনেককে দেখিতেছি, কিন্তু পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া বঙ্গের
কোলে জুড়াইতে আসিতে অল্পই দেখা যায়। সুতরাং পাঞ্জা-
বেরই জয়। এই কথায় হয় তো আমার বাঙ্গালী ভায়ারা
মনে মনে আমার উপর বিষম চটিবেন। তাঁহারা যে শৈবাল-
সঙ্কুল, পঙ্ক-পঙ্কজাধার, মশক-ম্যালেরিয়ার জননী পুষ্করিণী-
গুলিকে সরোবর আখ্যা দিয়া, জ্বলাকীর্ণ বাঙ্গালাকে কল্লনার
স্বপ্নের দেশ গঠন করিয়া বলেন,—“এমন দেশটি কোথাও
খুঁজে পাবেনাকো ভূমি”—আমি সে “স্বর্গাদপি গরীয়সী” মাতৃ-

নকল পাঞ্জাবী

ভূমির কথা বলিতেছি না। আপাততঃ আমি বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি, যেখানে পল্লীতে পল্লীতে ঘেঁষ-হিংসা, দলাদলির ঘন্বসমাস, পালাজরের অক্ষয় নিবাস এবং বার মাস প্ৰীহা যকৃতের চাষ হয়, আমি সেই মাটির বাঙ্গালার কথা বলিতেছি, “সোনার বাঙলা নয়,” এবং সেই সম্বন্ধেই বলিয়াছি, পাঞ্জাবের জয়!

এই জয় শেষ জয় কি না, না উহা পরাজয়েরই উদ্দাম বিক্রম—পরীক্ষার বিষয় বটে। তবে সে পরীক্ষা বাহিরের নয়, অন্তরের। অন্তরজয়ীই প্রকৃত জয়ী। দেখা যাক, এই অন্তর-যুদ্ধে কে প্রকৃত জয়ী।

২

পাঞ্জাব আমাদের জয় করিয়াছে—আমরা প্রবাসী পাঞ্জাবী। আজ এক পুরুষ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া আমাদের পাঞ্জাবে বাস। ইরাবতী শিখের গৌরবভূমি লাহোর নগরের আনারকালী গার্ডেনে—আনারকালী টুঙ্গর নিকটেই এক প্রস্তরনির্মিত ভবন আমার জন্মভবন—আমার গৃহ। লাহোর আমার শৈশবের মাতৃকোড়, লাহোর আমার বাল্যের ক্রীড়া-ভূমি, কৈশোর যৌবনের শিক্ষামন্দির। লাহোর-অধিবাসী আমার প্রতিবেশী, লাহোরের সঙ্গে আমি শত সংস্কারের সহস্র বন্ধনে জড়িত। সুতরাং কেহ যদি আমাকে লাহোরী অর্থাৎ

প্রথম প্রস্তাব

পাঞ্জাবী বলিয়া ভুল করে, তবে তাহার বুদ্ধি এবং বিচারের দোষ দেওয়া যায় না।

লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েক জনেরই সঙ্গে আমার পরিচয়। বলিতে লজ্জা নাই, প্রবাসী বাঙ্গালী দেখিয়া বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করিবার এবং আত্মীয়তা স্থাপনের জন্ত আমার প্রাণ তত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, এবং বোধ হয় তাহাদেরও তদ্রূপ একটা কিছু হয় না। আমার ধরণ ধারণ দেখিয়া আমার অপরিচিত বাঙ্গালীরা আমাকে পাঞ্জাবী এবং পরিচিতেরা আমাকে ‘পাঞ্জাবী ভাইয়া’ বলিয়া কৌতুকে সম্বোধন করিতেন। কেহ কেহ আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু আমি উহাতে না চটিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিতাম—“In Rome one must do as the Romans do.”



এ হেন পাঞ্জাবপ্রিয় যে আমি, সেই আমি যখন শুনিলাম, লাহোরের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মেয়ে একটি খাস পাঞ্জাবী বিবাহ করিবার জন্ত একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তখন সেই ‘আমি’রও বিলক্ষণই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

“তুনেছ মা ?”

নকল পাঞ্জাবী

“কি ?”

“মিঃ রায়ের আত্মরে নাতনীটি পাঞ্জাবী বিয়ে করবার
জন্তে ক্ষেপে উঠেছে।”

“যা—যা—বিরক্ত করিস্ নে, এখন আমার সময় নেই
—পূজোর সময় হয়েছে।”

“ও মামুলী পূজা তো আছেই—একটা নতুন পূজোর
কথা শোনোই না—পাঞ্জাবী পূজা—এমন কখনো শুনেছ ?”

“হরুনাম্কে ডেকে ব’লে দে, গম্‌ওয়ালীকে ব’লে আনুক,
কাল অস্ততঃ সের দশেক আটা পিষে দেয়।”

“তা তো দেবে,—তার আগে—এই বাঙ্গালী”—

“হাঁরে, মোহিত এ কয় দিন ধ’রে আনছে না কেন রে ?
শরীর ভাল আছে তো ? আজ সন্ধ্যার পর এখানে এসে
খাবে, ব’লে আসিস্।—আহা, ছেলে মানুষ, এই বিদেশে
একা!—কেন বাছা, দেশে কি আর এমন প্রফেসারি মেলে
না ! না, কোথায় বাঙ্গালা আর কোথায় পাঞ্জাব !”

“পূজোর সময় যে উত্তীর্ণ হ’য়ে গেল !—মোহিতের জন্তে
তো ভারী ভাবনা, এ দিকে সে বেচারী যে যায়—”

“কি, কি হয়েছে ?”

“হবে আবার কি ?—সেই কথাই তো বলছিলুম।—
মিঃ রায়ের নাতনীটি—”

“কি হয়েছে ?—মোহিত কি তাকে পড়ান ছেড়ে দিয়েছে ?”

“সখের পড়া—আতুরে মেয়ে—বিবিয়ানা ঢং—খেয়ালি মেজাজ”—

“তা কি করবে ? মেয়ের দোষ কি, মেয়েকে যেমন গড়েছে তেমন হয়েছে ।”

“তাহলে তোমারও ত তেমন হওয়ার কথা, কিন্তু তুমি তেমন না হ’য়ে এমন হলে কেন ?”

“তোকে পাঞ্জাবী ঢং কে শেখালে ?—যা, বিরক্ত করিস্‌নে । হরু নামুকে ব’লে দে, আজ কিছু বেশী ক’রে ভাল দই আনতে । মোহিত দই বড়া বড় ভালবাসে, সে দিন যে কয়টা বড়া দিলুম, সবক’টি খেলে, আর ছিল না, তাই দিতে পারলুম না । মনটা কেমন করতে লাগল !—বাক্কালায় তো আর এমন হয় না ।—হাঁরে, তুই না ব’লেছিলি, মোহিতের সঙ্গে মিঃ রায়ের নাত্নীর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে ?”

“তা ব’লেছিলুম, এখন আর বলছি না ।”

“মোহিত মেয়েটিকে কদিন ধ’রে পড়াচ্ছে ?”

“লাহোরে এসেই ।”

“হু—মেয়েটি কি পড়ে ?”

“ফিলজফি—ফিলজফি ।”

নকল পাঞ্জাবী

“ফিলজ্জি !—খুব পণ্ডিত মেয়ে তা হ’লে।”

“পণ্ডিত-পাঞ্জাবী বিয়ে করতে চায়। তা কাশ্মীরী পণ্ডিত হ’লেও কতকটা মানাতো।”

“তুই মেয়েটিকে দেখেছিস্ ?”

“মেয়ে-টি !—না—ধিন্কাটি বল—সে দিন ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল—রাইডিং ড্রেস—রাইডিং ক্যাপ, চাবুক হাতে—ওকি, হাস্ছ যে ?”

“বেশ তো।—পাঞ্জাবী বিয়ের কথা তোকে কে বলে ?”

“মোহিত বললে, আর কে বলবে ?—একেবারে—
কেপে উঠেছে !”

“ওঁদের পরিবারে কে কে আছেন ?”

“কেউ না,—এক বৃদ্ধ মিঃ রায় আর তাঁর আত্মরে
নাত্নীটি।”

“মা নেই ?”

“মা নেই—তাইতো মেয়ে এমন ধিন্কা হয়ে উঠেছে।
বাপ অল্প বয়সেই মারা যায়, মাও ছোট মেয়েটিকে রেখে
ধর্ম করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটলেন—মাগুলো এমনিই হয়
—তারপর বুড়ো দাদাই নাত্নীর মা বাপ হয়ে এতদিন
লালন পালন ক’রে এত বড় ক’রে তুলেছেন।—”

“মিঃ রায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল, তাঁরা একই

সময় বিলেতে যান। ছেলে বেলা মিঃ রায় আর্মায়ে কত কোলে পিটে করেছেন।”

“বল কি! আর গুঁরা এত কাল লাহোরে আছেন, আর আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই!”

“গুঁদের সঙ্গে তো আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক নেই। খুব ছোট বেলায় মিঃ রায়কে আমাদের বাড়ীতে আসতে দেখেছি।”

“আমাদের পরিচয় পেলে মিঃ রায় তাহ’লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন। এক দিন বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।—কি বল মা, তাতে দোষ কি?”

“না—দোষ কি।—তোর পাঞ্জাবী ঢং তো সেখানে চলবে না।”

“খুব চলবে।—বস্বিন্ দেশে যদাচার।—মা, আমি চলুম, মোহিতকে ব’লে আসিগে।”

“কিছু খেয়ে বেরো না।”

“না—না—একেবারে এসে তোমার সঙ্গে বসে খাব।”

৪

পাগড়ীটা বাঁধিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির হইয়াই দেখি, একখানা খালি একা ঘাইতেছে। উঠিয়া পড়িলাম। চল—কলেক্স, বোর্ডিং।

নকল পাঞ্জাবী

কলেজের বোর্ডিংয়েই মোহিত থাকে। একা বিদায় দিয়া বোর্ডিংএর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকিলাম। গিয়া দেখি, মোহিত ছাট্ কোর্ট পরিয়া তৈরী।

“মোহিত বাবু!”

“এস ভাই,—ভাগিয়াস্—আর একটু পরে এলে আর আমার নাগাল পেতে না।”

“নাগাল তো তোমার পাণ্ডয়াই ভার। ভদ্রতা রক্ষা আছে, আবার কারুর কারুর মন রাখতেও যেতে হয়। সে যাক্, আজ একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে কি?”

“সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক’রে।—কার নিমন্ত্রণ? তোমার?”

“না ভাই, আমার নয়, মা’র। তুমি সে দিন ভাল ক’রে খেয়ে আসনি; মা বল্লেন, দই-বড়া ছিল না ব’লে তোমার পেট ভরেনি; আজ তাই দই-বড়ার বিপুল আয়োজন। যাবে তো?”

“সে কি কথা! মা—তোমার মা কি আমার মা নয়?”

“কি জানি ভাই, কিন্তু দেখো, নিমন্ত্রণ রক্ষায় তো মন রক্ষার কোনো গোলযোগ হ’বে না?”

“সেখানে আপনিই গোল বেঁধেছে।—সে তো শুনেছ। পাঞ্জাবী বে’ করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।”

বলিয়াই মোহিত বুকের পকেট হইতে একখানি পত্র

প্রথম প্রস্তাব

বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি নারীহস্তের লেখা, কিন্তু পুরুষে ছাঁদ। আমি সকৌতুকে পড়িলাম।—

“প্রিয়তম, তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসা এক, বিবাহ স্বতন্ত্র। আমার দাদামণি একথা বুঝবেন না। তিনি উৎসাহে আমাদের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইতেছেন। তাঁহার বুদ্ধিবার সময়ও নাই; তা না বুঝুন, তুমি আমি একমত হইয়া যে কাজ করিব, তাহাতেই তিনি সুখী হইবেন, একথা আমি ভাল রকম জানি। সেদিন Inter-marriage সম্বন্ধে আমাদের যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি যে আমাদের জাতীয় উন্নতির উহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু উপায় বলিয়া তো নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না; সেরূপ কাজ না করিলে কি হইবে? তুমি কি বল, যদি তুমি একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিবাহ কর, এবং আমি একজন পাঞ্জাবীকে বিবাহ করি, তাহ’লে আমরা অপঃপাতিত এই ঘোর তমসচ্ছন্ন দেশকে আঁশাইতে পারিব কিনা? কি জানি কেন, এ উদ্দেশ্য এত মহৎ হইলেও আমার প্রাণের ভেতর কেমন কষ্ট বোধ হ’চ্ছে! আমরা দু’জনে ব’সে ব’সে কত সুখের ছবি এঁকেছি, কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি, সে ছবি মুছে ফেলতে হ’বে! উঃ—ভগবান্ মানবহৃদয়কে এত দুর্বল করেছেন কেন? পুরুষ মানুষদের হৃদয় কি এমনি

নকল পাঞ্জাবী

দুর্কল ? না আমি মেয়েমানুষ ব'লে, আমার এতো যত্ননা হ'চ্ছে ? তুমি কি বল ? আমার যত কষ্ট হ'চ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার তত কষ্ট হ'বে না। আমি জানি যে, তুমি অতি মহৎ, তোমার মত কজন আছে ? আমি তোমার হাতেগড়া পুতুল, তুমি আমায় বল দাও, নইলে আমি এ কঠিন কার্যে অগ্রসর হতে পারব না—আমি স্বার্থ বলি দিতে পারব না। তোমাকে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, তোমাকে সুখী করবার যে সুখ, তোমাকে ভালবেসে যে আনন্দ, তুমি আমার—একথা মনে করতে যে গর্ব, আমি স্ত্রীলোক তুমি না বল দিলে আমি কেমন ক'রে এসব স্বার্থ বলি দেব ? তুমি দাদামণিকে বুঝাইয়ো তোমায় মনে করলে আমার মনে একটা তেজ আসে—জোর আসে। পারব না ?—নিশ্চয়ই পারব। যদি আমি তোমার শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে না নিতে পারি, তার মত কাজ না করতে পারি, তাহ'লে আমি তোমার ছাত্রী হবার যোগ্য নই—স্ত্রী হবার তো নইই। আমার খালি একটা ভয় আছে, পাছে পাঞ্জাবী স্ত্রী তোমায় সুখী করতে না পারে। তা পারবে—পারবে—আমার মন বলছে—পারবে। তুমি অতি অল্পে তুষ্ট, তোমায় সন্তুষ্ট করা বেশী কথা নয়, নইলে আমি তোমার স্ত্রী হবার স্পর্শা করেছি কি করে ? এস আমরা দুজনে স্বদেশের কল্যাণের মন্দিরে আপনাদের বলি দি।

তা'তে তোমার মঙ্গল হবে—সত্য মঙ্গল হবে। আমি স্থির, এখন তুমিও আমায় টলাতে পারবে না। ইতি—”

আমার চিঠিপড়া শেষ হইতে না হইতেই বাহিরে “মোহিত বাবু আছ,” বলিয়া কে ডাকিল। মোহিত উক্ত ডাকে একেবারে চমকিয়া উঠিয়া শশব্যস্তে আমার কানে “মিঃ রায়” বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

“এই যে আসুন, আমি এখনই যাচ্ছিলুম, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন?—আপনার যেমন কাণ্ড!”

“আর কাণ্ড!—দাদা, না এসে করি কি? যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছ, স্থির থাকতে পারছি কই?”

বলিতে বলিতেই মোহিতের কাঁধে হাত দিয়া মিঃ রায় ঘরে ঢুকিলেন। পরিধানে সাদা খানের ধুতি, সাদা সার্ট, তার উপর সাদা চাদর ব্যাপারের মতো করিয়া গায় দেওয়া, পায়ে সাদা ক্যানভাসের জুতা, হাতে একগাছি আধমোটা সাদা আইভরি রঙের লাঠি। মিঃ রায়ের মুখখানিও তাঁহার পোষাকের মতন সাদা ধব্ধবে, তাহার উপর কোথায়ও কুটিলতার ছায়া নাই। কপালখানি প্রশস্ত উচ্চ, একেবারে অর্দ্ধমস্তক পরিবৃত টাকের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেই টাকের পশ্চাতে পক্কেশ, দুধের মতন সাদা, তাহাতেও কালোর ছায়া কোথায়ও নাই। চক্ষু দু'টি বৃহৎ, উজ্জল, উহাদের

নকল পাঞ্জাবী

কোণে কোণে ক্ষণে ক্ষণে একটু যেন রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ভাব লুকোচুরি খেলিতেছে। নাসিকাটি পাতলা লম্বা, তাহার নীচে ঠোঁট দু'খানিও পাতলা, তথা হইতে একটা অতি মধুর ব্যঙ্গের হাস্য যেন তাহাকে কোন মতে চাপিয়া রাখিবার যো নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ঠাকুরদাদার হৃদয়টি যেমন নির্জঞ্জাল, মুখখানিও তেমনি নির্জঞ্জাল—খর ক্ষৌরচর্চিত।

আমি নমস্কার করিলাম। লাঠিটি আশ্বে আশ্বে দেয়ালের গায় ঠেস্ দিয়া রাখিয়া দুই হাত ছোড় করিয়া বৃদ্ধ আমায় প্রতিনমস্কার করিলেন। তারপর চশমার ফাঁক দিয়া আড়নয়নে আমার মুখে চাহিয়া পরিষ্কার উর্দু মিশ্রিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপ্‌কো তবিয়ত্‌ আচ্ছা?”

মোহিত মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাক্ষাৎ পরিচয় নাই নাকি? ঠনি আমার বন্ধু, মিঃ টি, এস, মুখ্‌রাজ।”

মিঃ রায় একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

“মুখ্‌রাজ!—সেকি? পাঞ্জাবীদের এমন পদবী আছে নাকি?”

মোহিত হাসিয়া বলিল,—

“না ঠাকুরদা, এটি ওর স্বকপোলকল্পিত। ইনি আমাদেরই মতো বাঙ্গালী। চলিত কথায় ইঁহার নাম হচ্ছে তারিণীশঙ্কর মুখুজ্জ্য।”

ঠাকুর-দা বালকের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

“মখুজ্জ্য কিনা মুখরাজ!—হু—হা—হা—তুমি যে আমার নাতনীটিকেও ছাড়িয়ে উঠলে দাদা? দেখি, দেখি, তোমার মুখখানি ভাল ক’রে দেখি।”

বলিয়াই বুড়ো আমার কৃষ্ণ শ্মশ্রু ঢাকা চিবুকে হাত দিয়া বুড়ো ঠান্দিদির মতো মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন, এবং অঙ্গুলি কয়টির অগ্রভাগ দিয়া একটি চুমো খাইলেন। সে কি আনন্দ! বুড়ো একেবারে ভাবে গদগদ। তারপর আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

এই এক আলিঙ্গনে আমাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য একেবারে চলিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, বুড়ো যেন সত্য সত্যই আমার ঠাকুরদা। আমি বলিলাম—

“আপনি আমাদের চেনেন না।” কিন্তু মা আপনাকে জানেন। মার বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল। আপনারা একসঙ্গে বিলেত যান। আমার দাদামশাইয়ের নাম—গৌরী শঙ্কর বাড়ুসো।”

“বটে, বটে—তুমি গৌরীর নাতি! সেই ছোট টুকটুকে লখি মেয়েটি তোমার মা? তুমি ভাগ্যবান্ বটে, নইলে অমন

নকল পাঞ্জাবী

লখি মা পেয়েছ ! ছেলে বেলা তাকে কত কোলে করেছি, কত আদর করেছি, তার কত আবদার আমায় সহিতে হয়েছে !”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ যেন সেই অতীতের অতল জলে ডুবিয়া গেলেন। সেখানে কত মণিমুক্তা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কে বলিতে পারে ? তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যখন পুনরায় আমার পানে চাহিলেন, দেখিলাম, তাঁহার সেই উজ্জ্বল চোখ দু’টি যেন ঘোলাটে। তিনি নারী-সুলভ অভিমান করিয়া বলিলেন,—

“এই লাহোরে তোমরা আছ, আর আমার সঙ্গে পরিচয় করনি ?”

এই এক কথায় বৃদ্ধের হৃদয়খানি যেন আমার চোখের সামনে চিত্রের মত প্রতিভাত হইল। আমারও চোখ দু’টি ভিজিল। বলিলাম,—

“দাদামশাই, মা আজই আপনার কথা বলছিলেন।” বোধ হয়, একেবারে তাঁহাকে ‘দাদা মশায়’ বলিয়া ডাকাতেই বৃড়ো আনন্দে বিভোর হইয়া আমায় আবার তাঁহার সেই অজস্র স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, “বলছিল— বলছিল ! পাগ্‌লী কি বলছিল, বলতো, ভায়া ! বটে, বটে ! আমার কথা বলছিল ! কি বলছিল, ভায়া, কি বলছিল ?”

“বলছিলেন, ছেলে বেলা আপনি তাঁকে কত কোলে
পিঠে করেছেন”—

মিঃ রায় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন,—

“আয় শালা, কান ম’লে দি আয়! তুমি একদিনও
আমার সঙ্গে দেখা করনি!”

“এই তো সবে আজ বলছিলেন, দাদামশায়!”

“কি বলছিলেন ভাই, কি বলছিলেন?”

“বলছিলেন, আজ আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ীতে।”

“তোমার মাকে সেই ছোটটি দেখেছি, এখন কেমনটি
হয়েছে, একবার দেখতে বড় মাধ হচ্ছে। কিন্তু দাদা, তুমি
আগে পরিচয় দিতে পারবে না। আমাকে তিনি এতদিন
না দেখেও যদি চিন্তে পারেন, তবে আমার বড় আনন্দ
হবে। মোহিত আর আমি একসঙ্গে যাব।”

বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন সে সরল হাসিতে
একটু গাঙ্গুর্যের ছায়া পড়িল। মোহিতের দিকে ফিরিয়া
বলিলেন—

“না ভায়া, আমার যাওয়া হবে না।”

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেন ঠাকুর দা?”

বৃদ্ধ বলিলেন,—

নকল পাঞ্জাবী

“ছেলেবেলা যাকে সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা দেখেছি, আজ গিয়ে তাঁকে তপস্বিনী দেখব! দেখব, তাঁর মাথায় সিন্দূর নেই, হাত খালি! ভাই, আমার সে সোনার প্রতিমাই ভাল, তপস্বিনী দেখে কাজ নেই!”

বলিতে বলিতে দুইটি বড় বড় ফোঁটা বৃদ্ধের কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমার কঠোর পাঞ্জাবী বুকটাও গলিল। আমি তাঁর হাত ধরিয়া বলিলাম—

“তা হবে না দাদামশাই, তোমায় যখন পেয়েছি, ছাড়বনা, যেতেই হবে।”

চোখের জলে, হাসিতে মিঃ রায়ের মুখ ভরিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—

“মোহিত, শোনো শোনো, ছোঁড়া কি বলে, শোন। বলে, ছাড়বনা! তোমার না, এমনি ক’রে আমার হাত ধ’রে ব’লত ‘ছাড়ব না’!”

“কথায় ভুলালে হবে না, দাদামশায়, যেতে হবে। যাবেন বলুন?”

“ভায়া, ছাড়বনার আবদার যেদিন দাদামশায়ের প্রাণে পৌঁছুবেনা, সে দিন জেনো কোন কথাই আর তাঁর কানেও পৌঁছুবে না। স্নেহের আস্থানে যেদিন তিনি সাড়া দেবেন না, সে দিন জেনো তাঁর কণ্ঠও নিস্তব্ধ হবে। আর স্নেহের নিয়ন্ত্রণ

যেদিন রক্ষা করব না সে দিন জেনো আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণে এ হাটের দোকানপাট সব তুলতে হবে। যাব বই কি, ভাই!”

তারপর মোহিতকে বলিলেন,—

“এখন যে জন্ম এত তাড়াতাড়ি এসেছি, বলি—”

“এখন বলবার আগে এই চিঠিখানি একবার পড়ুন।”

বলিয়া মোহিত ঠাকুরদার হাতে তাঁহার নাত্নীর লেখা চিঠিখানি দিলেন।

চিঠি পড়িয়া ঠাকুরদা মোহিতের দিকে ফিরিয়া একটু গাশ্ঠীর্ষ্যের সহিত হাসিয়া বলিলেন—

“এতো জানি। এ হাদ্যম তো তুমিই বাধিয়েছ।” তারপর আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভায়া, সব জানেন কি?”

আমি একটু মুচ্কি হাসিয়া বলিলাম—

“আজ্ঞে, এই কিছু কিছু।”

ঠাকুরদা বলিলেন—

“বোঝার উপর শাকের আঁটি! কিছু কিছুর উপর আমি আরো কিছু চাপিয়ে দি। আমার একটি নাত্নী আছেন, তার মা বাপ নেই। সে আমার বড় আদরের। তারও ঐ

নকল পাঞ্জাবী

এক আবদার,—দাও, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার তেমন বয়স থাকতো, দাদা, আমি তাকে ছাড়তুম না—পরের হাতে দিতুম না।”

মোহিত বলিল,—

“ঠাকুরদা, আমায় কি পর ভাবেন নাকি?”

“আমি তো ভাবিনি ভাই, আপনার বলেই ভাবি, আরোও আপনার করবার ফিকিরে ছিলাম, কিন্তু তুমিই যে হান্ধাম বাঁধিয়ে পর হয়ে যাচ্ছ।”

আমি বলিলাম—

“ঠাকুরদা, ও সব হেঁয়ালির কথা রাখুন এখন। ব্যাপার-খানা কি বলুন দেখি?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মত জানিনি ভাই, কিন্তু আমার মত, দাদা, তাদের ভাল রকম শিক্ষিত করা। এদিককার পড়াশুনা একরকম শেষ করিয়ে ফিলজ্জফি শেখাবার জন্তে নাতনীটিকে মোহিত ভায়ার হাতে দিলুম। ফিলজ্জফি আমার বড়ই ভাল লাগে। বোধ করি, আমার নাতনীটিরও খুব ভাল লেগে থাকবে। নইলে শিক্ষার সম্বন্ধে শিক্ষককেও ভাল লাগবে কেন?”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

প্রথম প্রস্তাব

“তবে আপনার নাত্নীর এইরূপ চিঠি লেখবার মানে ঠাকুর দা ?”

“মানে তো ভাই, ওরি ভেতরে প্রকাশ। তার মনে কোনো কোরকাপ্ নেই। চিঠিতে যা লিখেছে মনেও তাই, নাত্নীটি আমার চিরকালই একটা না একটা খেয়াল, আব্দার নিয়ে আছেই। সে বার রেস্ (Race) দেখতে গেলুম ; ধরে বসল,—সেও জকি (Jockey) হয়ে রেস্ খেলবে। ঘোড়ায় চড়তে অবশ্য শিখেছে, কিন্তু এই জকি-বাই বাধা দিতে আমার চুলে আরও একটু রং ধরে গিয়েছে। এখন যে ফ্যাসাদে ফেলেছেন, সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে হয়।”

আমি বলিলাম,—

“সে বার তো রেস্ দেখে জকি-বাই উঠল, এবার পাঞ্জাবী-বাই উঠলো কি থেকে ?”

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

“সেটা দাদা, ভায়াকেই জিজ্ঞাসা কর।”

মোহিত বলিল,—

“একদিন কথায় কথায় কথা ওঠে, Natural selection সম্বন্ধে। তাই থেকে inter-marriage question উঠলো। আমায় জিজ্ঞাসা করে Intermarriage এর কি ফল। আমি বলিলাম, জাতীয় উন্নতি—নৈতিক, মানসিক সব সম্বন্ধে।

নকল পাঞ্জাবী

জনে আর কোনো কথা কইলে না, গুম্ হ'য়ে বসে বসে
ভাবতে লাগল।”

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন—

“আর শ্রীমানেরও কপাল ভাঙ্গিল।—ভায়া তো আমার
নাত্নীকে ফেপিয়ে চলে এলেন। আমি বেড়িয়ে বাংলায়
ফিরে গিয়ে দেখি, চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছি।
জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কিরে তোর হ'ল কি?’ নাত্নী বলে,—
‘Intermarriage’. জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কার সঙ্গে?’ সে আর
কিছু বললে না। মনে করলুম, পড়তে পড়তে বা অম্মনি কি
একটা ভাবছে। আমি খেতে বাড়ীর ভেতর গেলুম। ও
রোজ আমায় বসে খাওয়ায়। সে দিন—ও আর আমার কাছে
গেল না, আমারও খাওয়াটা ভাল হ'ল না। ফিরে বাইরে এসে
দেখি, বাগানের সামনে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ারে ঠায় বসে
আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—ওবিনি? বললে, ‘দাদা,
তুমি শোওগে, আমার দেরী আছে।’ আমি ওকে চিরকালই
জানি—হাবড়হাটি কতকগুলো কি ভাবছে। জিজ্ঞেস করলুম,
‘কিরে Intermarriage ভাবছিস্ না কি?’ একটু চম্কে
উঠলো, বললে ‘হাঁ, দাদা। আমি আজই একটা ঠিক না
ক'রে শোব না।—তুমি শোওগে, বুড়ো মানুষ কেন কষ্ট
পাবে?’ আমি বললাম, ‘তোর হয়েছে কি?’

প্রথম প্রস্তাব

“আমার যা হয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি শোওগে, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।”

“আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে তো শুতে পাঠিয়ে দিলে। রাত দুপুরে ভায়া, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, যে আমাদের সামনের বারাণ্ডাটায় যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। ভয় হ’ল যে, বুঝি জকি-বাই এখনও মেটেনি। তাই আপনা আপনি ঘোড়দৌড় খেলে। আন্তে আন্তে বিছানা থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলুম—‘কি, ব্যাপারখানা কি, বল দেখি?’

বললে,—

‘দাদা, মোহিত বাবুর সঙ্গে তুমি সব ঠিক ঠাক করেছ, কিন্তু আমি মোহিত বাবুকে বে করতে পারব না।’

সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

বলিলাম,—

‘সে কিরে, দিন ঠিক হয়েছে, আমি নিমন্ত্রণ-কার্ড ছাপতে দিয়েছি যে।’

বললে,—

‘বেশতো, ঐ দিনই আমার বিয়ে দিয়ে।—কিন্তু একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে।’

সেই ঘোর রাত্রি, চারিদিক নিশুন্ক! ভায়া নাতনীটির

নকল পাঞ্জাবী

মাথার ভিতর থেকে পাঞ্জাবীটা যেন ছুঁকার করে বেরিয়ে এলো ! আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—

‘পাঞ্জাবী কি রে ? পাঞ্জাবী বিয়ে করবি কেন ?’

বললে,—

‘দাদা, আমাদের বাঙ্গালী জাতটা বড় অধম হ’য়ে পড়েছে—এটা মান তো ?’

আমি আর কি করি, বললুম,—

‘হঁ স্বধু অধম ? অধম ধমাধম্ সব । তা দিদি, সেটাতো অনেক দিনের জানা কথা, তার জন্মে রাতে বারাগায় এত ছুটাছুটা করতে হবে কেন ? আমি খুব মানি ।’

‘বাস্, তা হ’লে আর কি,—সবই তো বুঝেছ ।’

আমি বলিলাম,—

‘ছাই বুঝেছি । তোর কথা গুলো সব খুলে বল ।’

নাত্নী বললে,—

‘আমিই বা ছাই আর কি বেশী বুঝেছি । মোহিত বাবু আগায় ষেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেইটুকুই বুঝেছি ।

ভাল, সেই ছাইটাই কি বুঝেছ দিদি শুনি ?’

বললে, ‘বুঝেছি যে, পতিত জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করতে গেলে প্রথম দরকার intermarriage. আমি ঠিক করেছি দাদা, আমি একটি পাঞ্জাবী বে

করব, আর মোহিত বাবুর সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের
বে দেব।’

আমি বললুম,—

‘যা করবি, যা দিবি, কাল সকালে যা হয় হবে, এখন
তো ঘুমুবি চল।’

‘না দাদা, যতক্ষণ না পাঞ্জাবী বিয়ে করছি, ততক্ষণ ঘুম
হবে না।’

‘কি সর্বনাশ! দিদি, আজ ঘুমুবি চল, আমি তিন
দিনের ভেতর তোকে বেড়ে দেড়ে খেড়ে পাঞ্জাবী বর এনে
দেব। কি করি, প্রতিজ্ঞা করলুম, কিন্তু বললুম যে, পাঞ্জাবী
পাত্র এনে দেব, গ’ড়ে পিঠে ঠিকঠাক করে নেওয়া তোমার
হাত।’

তা’তে নাতনী বললে,—

‘শুধু পাঞ্জাবী পাত্র হ’লে চলবে না, একটি পাত্রীও চাই,
মোহিত বাবুর নইলে উপায় কি হবে?—আমরা দুই জনেই
জাতীয় উন্নতির আদর্শ হব।’

আমি কি করি, তখন তারই গোড়ে গোড় দিলুম।
খুব উৎসাহিত হয়ে বললুম,—

‘হাঁ—হাঁ—পাঞ্জাবী নইলে কি আর বিয়ে? আমি সব
যোগাড় করব।’

নকল পাঞ্জাবী

মাত্নী বললে,—

‘দাদা, বড় ঘুম পেয়েছে, শোবে চল ।’

এই পর্য্যন্ত তো, ভায়া, হয়ে আছে, এখন উপায় কি
করি, বল ?

আমি বলিলাম,—

“উপায় তো অম্নি হাল্ফিল্ ঠাওরানো যায় না, জানেন
তো ইংরেজদের বড় বড় Question ডিনারএ (dinner)
সেটেল্ (settle) হয়। সন্ধ্যার পর যা হয় একটা ঠিক
করা যাবে। তখন মাও থাকবেন।”

ঠাকুর-দা এবং মোহিত, আমার প্রস্তাবে একেবারে
লাফাইয়া উঠিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, “বহুত আচ্ছা।”

৫

বাড়ী ফিরিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। আসিয়াই
দেখি, মা উদ্ভিন্ন হইয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন। আমি
বাড়ী ঢুকিয়াই মাকে বলিলাম,—

“মা, মা, আমি আজ একটা সোনার খনি পেয়েছি।”

মা আমার এই হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হর্ষোৎফুল্ল
মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন,— কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। দ্রুত
হাসিয়া বলিলেন,—

“সোনার খনি আবার তুই কোথায় পেলি ?”

“মোহিতের ঘরে ।”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“সোনার খনি পাবার যায়গাই বটে ! কথাটা খুলে বল ।—

একে বেলা হয়েছে, তোর খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমি উদ্ভিন্ন হয়ে রয়েছি,—সোনার খনি আবার কিরে ?”

“দাদা মশাই গো,—দাদা মশাই !”

মা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—

“কে দাদা মশাই রে ?”

“তোমার এক বাপ—ছেলেবেলা যার কোলে পিঠে উঠেছ, বলছিলে ।”

“ওঃ—মিঃ রায় !—তাই ভাল,—তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?”

“আ—লা—প ?—মা, অমন মানুষ কি হয় ! তোমার নাম শুনে আর সেই সব ছেলেবেলাকার কথা মনে ক’রে বুড়োর চোখ্ ছল ছল করতে লাগল । আমাকে কচি ছেলেটির মতো তার বুকের উপর টেনে নিলে ।”

“তুই তাঁকে আজ নিমন্ত্রণ ক’রে এলি নি কেন ? — সেই ছোট বেলায় দেখেছি, এখন দেখতে ইচ্ছে হয় !”

“কেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাব কেন ?—খামকা !”

নকল পাঞ্জাবী

“তোমার মতি গতি ধরণ ধারণ আমি বুঝতে পারি নে।—
এই সোনার খনি, হীরের খনি, কত কি বললি, আর খাওয়ার
বেলায় বুঝি সে কেউ নয়?—এখন খা দা, বিকেল বেলা
গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক’রে আসিস্। তোকে অত ক’রে আদর
করেছে!—”

“কি হিংস্ৰটে মা তুমি! আমাকে কখন কি একটু
আদর করেছে, অমনি তোমার মনে বিষ হয়েছে; আর
তুমি যে ছেলেবেলা তাঁর অত আদর খেয়েছ, আব্দার
ক’রে হাত ধরতে আর বলতে—‘ছাড়ব না’!—দেখ মা,
বুড়ো যখন তোমার কথা বলতে লাগল, আমার মনে সত্যি
মা একটু বিষ হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি
ঐ বুড়ো হতুম, আর আমার ছোট্ট মা-টি অমনি ক’রে আব্দার
করতো—‘ছাড়ব না!’”

আমি বেশ দেখলুম, মা’র চোখ দুটি একটু চকচকে
হ’য়ে উঠলো, কিন্তু মনের ভাব চেপে বললেন,—

“নে—নে—শীগ্গীর খেয়ে নে। তার পর তাঁকে
গিয়ে নিমন্ত্রণ ক’রে আয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“তোমার পূজো সারা হয়েছে?”

মা বলিলেন,—

“না। একটু জপ বাকী আছে।”

“তবে তাড়াতাড়ি উঠেছ কেন?”

“তোমার আস্তে দেবী হচ্ছে ব’লে স্থির হ’য়ে জপ করতে পারলুম না।”

মায়ের এক ছেলে হওয়া কি বিপদ! ছেলের দ্বারা এঁদের ধর্ম কৰ্মেও বিঘ্ন হয়। ছেলেই ইষ্টি, ইহকাল পরকাল—সব। আমি বলিলাম,—

“তা হবে না, তুমি জপ সেরে নাও। আমি যা বলেছি, তা করব—তোমার সঙ্গে ব’সে থাক।”

মা বলিলেন,—

“ওমা! সে কি হয়! আমার এখন কত দেবী হবে। খাবি, দাবি, একটু জিকবি তো, তা হ’লে তুই কখন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাবি?”

আমি বলিলাম,—

“মা, নিমন্ত্রণ তাঁকে আমি ক’রে এসেছি।”

তার পর মা’র জপ সারা হইল, আমরা দুজনে আহারে বসিয়া গেলাম। বুড়ো ছেলে মায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে—এটা বাঙ্গালার দৃশ্য, না পাঞ্জাবের দৃশ্য, না সমগ্র পৃথিবীর দৃশ্য—কি করিয়া বলিব? আমি প্রবাসী, আমার কথা আলাহিদা, আমি সকল নিয়মের বাহিরে।

নকল পাঞ্জাবী

খাইতে খাইতে মাকে বলিলাম,—

“মা, একটা বড় অন্ডায় কাজ ক’রে ফেলেছি।”

শুনিয়া মার হাতের গ্রাস হাতে রইল, আমার দিকে
বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—

“কি করেছিস্? কোথায়ও মারামারি করেছিস্ না কি?”

“না মা, না—সে ভয় নেই। আমি পথে বেকলেই
তুমি বুঝি ভাব, আমি মারামারি করি।”

“তা বাছা, সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে একটু
ভয় আছে বৈ কি, তোমার ছেলেমানুষী স্বভাবটি তো
এখনো যায় নি? আমার সঙ্গেই কত খুনসুড়ি কর!—কি
করেছিস্, বল দেখি?”

“সে ক’রে ফেলেছি, আর তোমায় ব’লে কি হবে?”

“না—না—বল, বল—নইলে আমার ভাল খাওয়া
হবে না।”

“দাদা মশাই তাঁর কথা তোমায় আগে বলতে বারণ
ক’রেছিলেন। এত দিন না দেখেও তুমি তাঁকে চিন্তে পার
কি না।”

মা ফোন্স ক’রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলিলেন,—

“বাছা, সে মুখ কি ভোলবার? আমার বাবার মুখের
সঙ্গে সে মুখ যে মনে গাঁথা হ’য়ে আছে। লক্ষ লোকের মাঝ-

খানে থাকলেও আমি তাঁকে চিন্তে পারতুম।—তা তুই বল্লি কেন ?”

“বেশ, তুমিই যে কথায় কথায় আমার পেটের কথা সব বের ক’রে নিলে !”

“শোনো, ছেলের কথা ! আপনি ছুটে এসে বল্লেন—সোনার খনি, হীরের খনি—কত কি !”

“তা মা, আমি তোমার কাছে কোনো কথা লুকুতে পারি না। আচ্ছা, পারি না কেন মা ?”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—

“বাছা, কেন তা জানি নি, কিন্তু আশীর্বাদ করি, যেন তোমার এমনি শিশুর মতো সরল মনটি বরাবর থাকে।”

“কেন মা, না থাকবে কেন ?”

মা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

“যখন বে করবি, তখন কি আমি পর হব না ?”

“মা, যদি তোমায় পর করতে হয়, এমন বিয়ে আমি করব না।”

তার পর কথায় কথায় দাদামহাশয়ের নাত্নীর কথা, তার পাঞ্জাবী বর-বাই, মোহিতের মুনভঙ্গ—ইত্যাদি সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তার পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

নকল পাঞ্জাবী

“মা, তোমার বউ এসে যদি এমনি পাঞ্জাবী বে করবার
জন্তে কেপে ওঠে ?”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“দূর মূর্খ !—হাঁ রে, মোহিতের খুব দুঃখ হয়েছে, না ?”

“তা হবে না, মা ?”

মা বলিলেন,—

“কেন, কিসের দুঃখ ? মেয়ে যা ধরবে তাই ? এখন যদি
ধ’রে বসে, একটা ভূত বে করবে, তাই অমনি ভূত এনে দিতে
হবে না কি ?”

“হঃ—তুমি তো জাননা মা, সে কি রকম আব্দেরে এক
শুঁরে মেয়ে ! তার এক একটা বাই নিবৃত্তি করতে দাদা-
মশাইয়ের মাথায় এক পৌঁচ ক’রে কলি ফেরে ।”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“সে আবার কি ?”

“পাকা চুলে আরো পাকা রং ধরে গো ।”

“আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে. আগে তোমার দাদা
মশাই খেতে আসুন ।”

আমি বুঝিলাম, মোহিত সৌভাগ্যবান্ । আমার মায়ের
সহায়ত্বটি সে পাইয়াছে ।

৬

“মুখরাজ !”

মা তখন খাবারের আয়োজন করিতেছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলাম। এমন সময় বাহির বাটী হইতে ডাক আসিল,—“মুখরাজ !”

এই নামে আমাকে অনেকে ডাকে, কিন্তু এ ডাক শুনিয়া মা যেন একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন, স্বর যেন দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল। আমি বিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, কে বল দেখি ?”

মা একটু হাসিলেন। সে হাসিটি যেন চোখের জলে একটু সরস। মায়ের গলাটাও একটু ভিজা ভিজা। বলিলেন, “ও গলা কি ভোলবার ! কতদিন আগে ঐ স্বর আমার বাপের বাড়ীর দরজায় আসিয়া আগে ‘মা’ বলিয়া ডাকিত, সে-ও এমনি স্নেহমাখা। তুই আর দেবী করিস্নে, যা, ঠাই ঠুই করি, তুই তোমর দাদামশাইকে ও মোহিতকে ডেকে নিয়ে আয়।”

আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই ঠাকুরদা বলিলেন,—

“কি হে ! কোন উত্তর দিলেনা, মনে করেছিলে বুঝি

নবল পাঞ্জাবী

বুড়ো ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে চলে যাবে ? এ তেমন
পাস্তোর পাওনি ।—যাক্, আমার কথা সব বলেছ নাকি ?—
এঁ—সব মাটি ক’রে দিয়েছ ! আমি রাস্তায় কত কথা মনে
করতে করতে আসছি—”

আমি বলিলাম,—

“ঠাকুরদা, আপনাকে কিন্তু ঠাকুরদা বলতে আমার
ইচ্ছে করে না ।”

“কেন বল দেখি ?”

“ঠাকুরদা বলতে মনে হয় যেন সেই তেরকেনে
বুড়োটি ! সত্যযুগের না হোক, অস্ততঃ ত্রোতার বটে !”

“ওরে শালা ! আমি কি কালকের খোকাটি না কি ?”

“তা হোক, ঠাকুরদা, তোমার কথা মাকে ব’লেছি বটে ।
মার কাছে আমি কিছুই লুকুতে পারি না । বলায় কিন্তু কোনো
লোকসান হয়নি, ঠাকুরদা । মা তোমার আওয়াজ শুনেই
চকিত হ’য়ে উঠলেন, বললেন,—‘ও গলা কি ভোলবার !’

“বটে বটে ! চল—শীগ্গীর চল ।”

“দাড়াও ঠাকুরদা, ঠাই হয়েছে কিনা দেখে আসি ।”

“শালা, তুই তো কাল এসেছি ! আমি এসেছি তোমার
অনেক আগে । আমার মাকে আমি জানিনে, তুই আমায়
চিনিয়ে দিবি ? মায়ের কাছে আমার ঠাই সব সময় পাতা !”

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, মা ঠাই করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরদা ঘরে ঢুকিবামাত্রই মা গলায় আঁচল দিয়া তাঁর পায়ের ধূলিগ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদা মার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন,—

“তুমি কেমন মা!—আমি যে পথে পথে মা মা করে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তা একবার মনে করতে নেই?”

মা মৃদু মৃদু হাসিয়া ঠাকুরদাকে বলিলেন,—

“বহন—মোহিত, বস—খোকা!—”

“দেখেছেন ঠাকুরদা, মায়ের আঁকল,—আমি এখনো খোকা।”

মোহিত হাসিল, মা হাসিলেন, কেবল ঠাকুরদা না হাসিয়া বলিলেন,—

“ভায়া এত তাড়া কচ্ছ কেন? বড় ভয় হবেই। যতদিন খোকা হ'য়ে মায়ের কাছে আব্দারের দাবীটা রাখতে পার, ততদিন ভাল নয় কি? আমার যদি মা থাকতেন, আর এই বয়সে আমায় খোকা ব'লে ডাকতেন, লোকে হাসতো বটে, কিন্তু আমি গিয়ে মায়ের আঁচল ধরতুম!—শালা! ও তো বললে, খোকা; আমি যে বলব, আমার খুকীর খোকা! ভায়া, মাকে এখন থেকে বিশেষ করে

নকল পাঞ্জাবী

আগ্‌লাও । আমি যখন এসেছি, মা নিয়ে দুজনে ঝগড়া হবে ।”

আমি হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু মায়ের মুখে দেখিলাম, কি অপূর্ব শ্রী ! উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পদ্মের মতন ফুটে উঠেছে ! মা হাসিয়া—সে হাসি কি মধুর !—বলিলেন,—

“বাবা, খোকার সঙ্গে তোমার মা নিয়ে ঝগড়া আমি বেঁচে থাকতে তো আর মিটবে না ! এখন খাবার জুড়িয়ে যায়, খেতে বস ।”

আমরা আহারে বসিয়া গেলাম । মা পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।

আহার করিতে করিতে ঠাকুরদা বলিলেন—

“মা, তুমি বোধ হয় সব কথা শুনেছ !—আর যে কয়টা দিন আছে, কোনো রকমে কাটিয়ে দেব—ভেবেছিলুম, কিন্তু ভগবান্ দেখছি, কিছুতেই ছাড়ছেন না । লোকে দেখছে—হাসছি, খেলছি, বেশ সুখে আছি !—মা, নাম যশ অর্থ মানুষ যা পায়, সবই পেয়েছি । মানুষ না বুঝে চায়, পেয়ে কিন্তু পরে হায় হায় করে ! যখন মা, চেয়েছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে, চেয়েছি কতগুলি অজ্ঞান । যে ভার বয়সে হেলায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াতুম, এখন সে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

প্রথম প্রস্তাব

তুমিই বল দেখি, মা, আর কি এ বয়সে সংসারের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে পারি? ভগবান্ সব বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়েছেন, একটি মাত্র রেখেছেন, এ বন্ধনটি এখন আর কারুর গলায় বেঁধে দিতে পারলে, আমি কর্তব্য দায় থেকে নিষ্কৃতি পাই। সব ঠিকঠাক হয়েছিল, কিন্তু আমার কপাল দোষে সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেল। কেবল কপালের উপর সব দোষ চাপিয়ে ঠিক খালাস হ'তে পারছি কই? মনে হয়, আনিও অনেক ভুল ক'রেছি, একেবারে নির্দোষী নই।”

মা বলিলেন,—

“বাবা, ভুল ভ্রান্তি সবারই হয়। কেবল হায় হায় ক'রলে তো আর তার উপায় হবে না? ভুল হয়েছে যখন বুঝেছেন, এখনো দিন আছে, এখনো উপায় হ'তে পারে শোধ্রাবার।”

ঠাকুরদা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “উপায় যে কি হ'তে পারে, এখনো তো ঠিক করতে পারিনি, মা!”

মা বলিলেন,—

“এমন কিছুই নেই, আর উপায় হয় না। এখন আমার এই দশা হ'ল, খোকা ক'চি ছেলে। কি হবে, কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলব ভেবে আকুল হ'য়েছিলুম। খাবার পরবার

নকল পাঞ্জাবী

ভাবনা ছিল না, অবিশিা সে একটা প্রধান ভরসা, কিন্তু সেই ভরসাই আমার ভয়ের কারণ হ'ল। কে ঠকিয়ে নেবে, টাকার অন্তে কত লোক শত্রু হ'বে—কত যে ভেবেছি, তা তো তুমি বুঝতে পাচ্ছ। কিন্তু বাবা, দেখ, জগদম্বার কৃপায় খোকাকে তো এক রকম মানুষ ক'রে তুলেছি।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“শুধু মানুষ কেন মা, মানুষের মতো মানুষ করেছে।”

মা বলিলেন,—

“বাবা তুমি জ্ঞানী, অনেক দেখেছ, আমি আর তোমাকে কি বলব! একটা বিপদ এলেই মানুষ আঁকু পঁকু ক'রে হাল ছেড়ে দেয়।—”

ঠিক সেই সময়ে মোহিতের দইয়ের বড়ার পাত্রও প্রায় শূন্য হইল। একটা মাত্র ছিল, মোহিত সেটি নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। আমি বলিলাম,—

“মোহিত, একেবারে হাল ছাড়তে হবে না। আমার মায়ের ভাণ্ডার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ফুরোবার নয়।”

মা ‘তাই তো, তাই তো’ বলে আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া মোহিতকে বড়া দিলেন, ঠাকুরদাকেও দিলেন, কিন্তু আমাকে দিলেন না।

“মা!”

বলিতে না বলিতেই মা বলিলেন, “তুই আর খাসনে, অসুখ করবে।” ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

“ভায়া, তোমার কাছে হার মানলুম। হাঁ মা, খোকার অসুখ করবে, আর আমাদের শরীরগুলো বুঝি মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়নি! এগুলোর আর বুঝি সুখ অসুখ নেই।— তা যাক এখন তোমার কথায় মা, আমার ভরসা হচ্ছে। কি উপায় করি, বল দেখি?—হাঁ হে মোহিত, তুমি কিছু ঠাও-রিয়েছ? না তুমি খালি গোল বাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত, তার পর যা পারে, বুড়ো শালা করুক, আর মরুক।”

মোহিত বলিল,—

“এর আর উপায় কি ঠাওরাব, ঠাকুরদা, তার যদি এতই মন হ'য়ে থাকে, পাঞ্জাবী বিয়ে করবে, তা'তে আমার বাধা দেবার দরকার কি?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“হা কপাল! ‘মন হ'য়ে থাকে’—মন হ'লে ত বুঝতুম? এ যে খেয়াল! মন তো মোহিত; কিন্তু এতো তা নয়, এ যে দেশের হিত! তিনি নিঃস্বার্থ হ'য়ে দেশের হিতে আপনাকে বলি দিচ্ছেন। তুমি নিঃস্বার্থ হ'য়ে তার সহিত আপনাকে বলি দিচ্ছো—তোমরা যে সকলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে! একটা কিছু বিহিত কর।”

নকল পাঞ্জাবী

মোহিত বলিল,—

“তা কি করব ঠাকুরদা, ছেলেবেলা থেকে কখন কোনো ইচ্ছায় কোনো বাধা তো পায়নি? এখন বড় হয়েছে।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“শুন্ছ মা, ঢিলটা কোন্‌দিকে আস্ছে, বুঝতে পাচ্ছ?”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“তা পাচ্ছি, বাবা, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, ও আর কি বিহিত করবে?”

ঠাকুরদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—

“তা বটে মা, তা বটে! কিন্তু মা, আন্তর্জাতিক বিবাহের কথাটা তার কাছে না তুললে আর এত অন্তর্ঘাতনাটা তো হতো না? সে থাক, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি কি ঠাওরাও?”

মা বলিলেন,—

“বাবা, তোমায় আমি কি পরামর্শ দেব? তবে ছেলে যখন আগুন নিয়ে খেলা করবার জন্মে পাগল হয়, তখন তার হাতটা ধ’রে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বুলিয়ে দিতে হয় যে, তার তাত্‌কত!”

মায়ের কথার মর্ম্ম আমি বুঝিলাম।

“ঠাকুরদা, হয়েছে! মা বলছেন যে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের মিল হতে পারে না—এইটে আপনার নাত্নীকে বেশ ক’রে বুঝিয়ে দিতে হবে। পাঞ্জাবীদের আচার ব্যবহার ধরণ ধারণের সঙ্গে আমরা ঠিক মিশ খেতে পারব না। এইটে যদি আপনার নাত্নী বুঝতে পারে তা হলে আর এ বাই থাকবে না।”

ঠাকুরদা টাকে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

“উপায় তো বললে ভায়া, কিন্তু জোট্‌পাট্‌ সব হয় কেমন ক’রে?”

আমি চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়, আমার মাথায় তৎক্ষণাত্ একটা মতলব গজাইয়া উঠিল। বলিলাম,—

“ঠাকুরদা, আমার একটি বন্ধু আছেন,—খাস পাঞ্জাবী, একেবারে আহেলা বিলাত, আপনাদের বাঙ্গালায় যাকে বলে ‘পাড়াগেঁয়ে ভূত’। সেই পাড়াগেঁয়ে পাঞ্জাবী ভূতটির শরণাপন্ন হতে হবে।”

ঠাকুরদা মুচ্কি হাসিয়া বলিলেন,—

“তার পর? বলে যাও।”

“তার পর আর কি, ঠাকুরদা, তাকে দেখলে, পাঞ্জাবী বিয়ে তো দূরের কথা, আপনার নাত্নী একেবারে পাঞ্জাব থেকে ছুটে পালাবেন।”

নকল পাঞ্জাবী

মোহিতের মুখে চাহিয়া দেখিলাম, একটু আতঙ্কের ছায়া।
তার কানে কানে বলিলাম,—

“ভয় নাই, ভায়া ! সে খুব বিশ্বাসী, আমায় যদি বিশ্বাস
করতে পার তো তাকেও পার।”

ঠাকুরদার মুখে চাহিলাম, দেখিলাম তাঁর চক্ষে এবং অধরে
সেই রক্ত এবং রহস্যের হাসিটি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাকে
উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—

“আচ্ছা ভায়া ! এ অক্ল পাথারে তুমিই কাণ্ডারী।”

আমি বলিলাম,—

“স্বীকার। জাহাজ আমি ঠিক চালাব, কিন্তু আপনাকে
একটি কাজ করতে হবে। সেই পাঞ্জাবীকে আপনার বাড়ীতে
পাঠিয়ে দেব, আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আপনার নাত্নীর
সঙ্গে পাঞ্জাবী ফ্যাসানে কোর্টশিপ হবে। আপনার নাত্নীকে
প্রস্তুত করে রাখবেন।”

ঠাকুরদা উৎসুক হইয়া বলিলেন,—

“কবে ভায়া, কবে ?”

আমি বলিলাম,—

“পরশু।—মোহিত থাকবে কি ?”

ঠাকুরদা মোহিতের মুখ নড়িবার পূর্বেই বলিয়া
উঠিলেন,—

“নিশ্চয় ! যে জোট পাকিয়েছে, তাকেই তো খুলতে হবে !”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“ঠাকুরদা, আখার বন্ধুকে তো পাঠাব, কিন্তু আপনার নাত্নীর সম্বন্ধে একটু হৃদিস্ তাঁকে না দিয়ে দিলে হবে কেন ?—আচ্ছা, এমনটা হ’ল কেমন ক’রে ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“ভায়া, শোনো, আগাগোড়া সব বলি।—ছেলে পাঞ্জাবে চাকরী করতো। আমার স্ত্রী মারা গেল, চাকরী থেকে অবসর নিলুম। আমার নিতান্ত নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থা দেখে ছেলে ছেদু ক’রে পাঞ্জাবে আনলে। আজ প্রায় বিশ বছরের কথা। বৌমার যত্ন আমি কখনো ভুলব না। আমার কন্যাসন্তান নাই, সে আমার সে অভাব পূরণ করেছিল ; কিন্তু সুখ আমার অদৃষ্টে নয় না ! এই যে আমি এত সফুর্তিতে থাকি, দেখছ, সেটা কেবল জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি ব’লে। আমার এ সফুর্তি দুঃখের সঙ্গে ঝগড়া। দুঃখ যত আমার বুক চেপে ধরে, আমি এই সফুর্তির ফোয়ারা উড়িয়ে ভাসিয়ে দিই। বৌমার কাছে পাঞ্জাবে এসে দিনকতক বেশ রইলুম। আমার ছেলের চেয়েও বৌমা আমায় বেশী স্নেহ করতেন। কিন্তু তোমায় ব’লেছি তো, সুখ আমার নয় না।

নকল পাঞ্জাবী

বছর দুই বেশ কাটল, তার পর ছেলেটিকে একদিন হারালুম। বোঁমা তখন আসন্ন প্রসবা; বোধ হয় গুরু শোকে সময়ের পূর্বে একটি কন্ডাসন্তান হলো। তিনি সেটিকে আমার কোলে দিয়ে নিশ্চিত হ'য়ে চোখ বুজলেন। তার পর যে কষ্টে পাঞ্জাবী দাই রেখে নাতনীকে মানুষ করেছি, সে আর তোমায় কি বলব! পাঞ্জাবীর মাই দুধ খেয়ে নাতনীটি বেশ হুঁপুঁপু বন্নিষ্ঠ হতে লাগল, আর স্বভাবটা হ'লো পুরুষ মানুষের মতো তেজী। একে এই, তারপর পুরুষ মানুষের সাহচর্য, পালন! অন্য মেয়ে যখন পুতুল খেলা করে, এ তখন মার্কেল খেলে, লাটিম ঘুরোয়। আমিই একমাত্র সঙ্গী, মেয়েলি অভ্যাস হবে কোথা থেকে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ঘুড়ি লাটাই, ব্যাটবল হলো। তারপর ঘোড়ায় চড়তে শিখতে চাইলে, শেখালুম। মাষ্টার রেখে দিলুম, মেয়েটার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি, তরু তরু ক'রে শিখতে লাগল। আবার ভগবানের এমনি মার, যতই বড় হতে লাগল চোখ দুটো হ'ল বাপের মতো, গলার স্বর হ'ল মায়ের মতো। আমি এতে আমার ছেলে বোঁ দু'জনকেই দেখতে পাই। যখন কথা কয়, মনে হয়, আমার বোঁমা কথা কচ্ছেন; যখন আমার মুখের উপর ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তুলে চায়, আমার সেই ছেলেকে মনে পড়ে। ছেলেবেলা মেয়েদের মতন ক'রে কাপড় প'রত

না ; ঝুঁটি বেঁধে, মালকোঁচা মেয়ে যখন খেলত, আমার মনে হ'ত যে সে ব্রজের রাখাল । ক্রমে আরো বড় হল, যখন বার বছর বয়স, তোমাদের মনে আছে কি না জানিনা, এখানে একজন লেডি বেলুনিষ্ট এসেছিল, সে মাগী টিকেট করে বেলুন ওড়া দেখাত—পঁচিশ টাকা বেশী দিলে সঙ্গে নিয়ে একবার উড়াতো । আমি একদিন নাত্নাকে নিয়ে দেখতে গেলুম ।

উঃ—সে কি উৎসাহ ! যেখানে গ্যাস্ পোরা হচ্ছে সেখানে যাচ্ছে, একবার আমার কাছে ছুটে আসছে ; এটা কি, ওটা কি,—সে মাগীকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে ব্যস্ত ক'রে তুলেছে । মাগী কিন্তু ব্যাজার নয়, হাসছে আর তার কথার জবাব দিচ্ছে । আমার একজন বহুদিনের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, গল্পে গল্পে একটু অন্তমনস্ক হলাম, শুয়ে কোথায় কি করছে, খানিকক্ষণ খোঁজ রাখতে পারিনি । হঠাৎ মনে হ'ল,—গেল কোথায় ! তাড়াতাড়ি উঠে চারদিক খুঁজে দেখি, কিন্তু কোথায়ও দেখতে পাইনি ! আমি তো মহা ব্যাকুল হ'য়ে ভাবছি, এমন সময় আকাশ থেকে আওয়াজ এল—‘দাদামণি, তুমি ভেবো না, আমি একটু বেড়িয়ে আসছি ।’ উপর দিকে চেয়ে দেখি, বেলুনের কার্ ধ'রে ঝাড়িয়ে আছে, মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই । আমি ধপ্ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লুম । খানিকক্ষণ আমার আর

নকল পাঞ্জাবী

কোনো চৈতন্য ছিল না। দেখতে দেখতে বেলুন অদৃশ হ'য়ে গেল, আমার মনে হল, আমার এ সংসারের সঙ্গে যে একটু বন্ধন ছিল, তা-ও ঘুচল। বন্ধু আমায় ধ'রে গাড়ী ক'রে বাড়ী নিয়ে এলেন। প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কি রকমে যে কেটে গেল, তা আজও ভাবতে গলে আমার কি রকম হ'য়ে যায়! তারপর 'দাদা, দাদা' ব'লে ডাক্তরে ডাক্তরে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'কি মজা! কি আনন্দ!' তার পর আমার মাথার দিকে চেয়ে বললে 'দাদা, তুমি চুলে খড়ি মেখেছ কেন?' আমি তাড়াতাড়ি উঠে আয়নায় মুখ দেখি দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টার ভেতর আমার মাথার অর্ধেকের উপর চুল পেকে গেল, তার পর ছছ ক'রে টাক পড়তে শুরু করল। নাতনী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যখন দেখলে, খড়ি নয়, তখন আমার কোলের উপর ব'সে চুপ্ ক'রে মুখ নীচু ক'রে খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তার পর আমার গালে হাত বুলিয়ে বললে, ঠিক যেমন ওর মা আমায় আদর করতো, ভোলাতো, তেমনি ক'রে বললে, 'দাদা, তোমাকে না ব'লে আমি আর কখনো কোনো কাজ করব না।' সেই থেকে দেখলুম যে, ওর সে বালক ভাব ঘুচে যেন প্রবীণা গিন্নী হ'য়ে পড়ল। সেই ওর মার মতন যত্ন ক'রে ব'সে থেকে আমায় খাওয়ায়, আমার কোনো বিষয়ে মন

প্রথম প্রস্তাব

ধারাপ বা রাগ হ'লে আদর ক'রে ভোলায়। কি শক্তি ওর আছে, জানিনে, কিন্তু যখন আমার গলা জড়িয়ে গালে হাত বুলুতে বুলুতে কোনো আবদার করে, আমি 'না' বলতে পারি না। তবে যেখানে বিপদের আশঙ্কা, সেইখানে আমাকে একটু শক্ত হতে হয়। তোমাকে তো 'জকি' বাইয়ের কথা বলছি!"—

আমি বলিলাম,—

“হাঁ ঠাকুরদা, সে সব তো শুনেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, এ পাঞ্জাবী খেয়াল কেটে যাবে। যার হৃদয় আছে, তাকে শোধরানো শক্ত কথা নয়।”

৭

পরশু আসিল। সারাটা দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত হইল। ফাস্তনের শেষ, স্ততরাং পুরোপুরিই বসন্ত। তবে বাংলার বসন্তে আর পাঞ্জাবের বসন্তে ঢের তফাৎ।

কোকিলের কুহ কুহ, ফুরুরে হাওয়া, ফুট ফুটে জ্যোৎস্না, যুই বেলার মিঠে মিঠে গন্ধ, ফিন্ফিনে বাসন্তী শাড়ী, এলোচুল শুধু একটি ফিতে দিয়ে বাঁধা, সব শেষে টুকটুকে ঠোঁট —বাংলার বসন্তের ইহাই মোট কথা। দিনে রাতে, প্রভাতে.

নকল পাঞ্জাবী

সন্ধ্যায়, আলোকে আঁধারে বাংলার বসন্ত অন্তরে বাহিরে
বিরাজিত ।

পাঞ্জাবে তা নয় । দিবসে গরম হাওয়া, রাত্রে শো শো
হাওয়া । প্রভাতে শান্তস্নিগ্ধ, দুপুরে দরজা জান্না সব বন্ধ ।
ফুল—ফুল ফোটে বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে—কখন শুকাইয়া
যাইবে । বসন্ত হেথায় অভিসার নয়, সংগ্রাম—কোমলে
কঠোরে ।

প্রাচীন লাহোর বাদশাহী আমলের দিল্লীর একখানি
ছোটখাট স্মৃতি । বর্তমান লাহোর সে স্মৃতিকে কতকট
টাকিয়া ফেলিয়াছে । বাংলো, বাগান, আলো, রাস্তা,
আফিস, কলেজ, চার্চ—এ সব দেখিয়া মনে হয়, একদিন
লাহোর শুধু নামেই লাহোর থাকিবে । সে দিন পাঞ্জাবী
আর পাঞ্জাবী থাকিবে না ; নকলে আসলে মিলিয়া এমন
একটা কিছু দাঁড়াইবে, যে খাস্ পাঞ্জাবের খাস্ পাঞ্জাবী
প্রদর্শনীর জিনিষ বলিয়া গণ্য হইবে । সে শুভ দিন প্রায়
সমাগত, সুতরাং আমরা সে শুভ দিনের সুযোগ গ্রহণ না
করিব কেন ?

শুভ মুহূর্তে 'ওয়া গুরুজীকা ফতে' বলিয়া পাঞ্জাবী বন্ধ
বাহির হইয়া পড়িল । বাহির হইবার পূর্বে বন্ধুকে অনেক
তালিম দিলাম । কোর্টশিপ্ জিনিষটা তাহার জীবনের

প্রথম প্রস্তাব

ইতিহাসে নৃতন, আরও নৃতন উহার অভিনয়। যে যাহা নয়, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে—ঠিকঠাক। চোর সাধু সাজিতেছে, কুটিল সরলতার অভিনয় করিতেছে, জঘন্যচরিত্র মহাপুরুষের অভিনয় করিতেছে। নকল আসলের নকল করিতেছে—সংসারের নিত্য লীলা। নিত্য লীলা—মন্দ ভালোর নকল করিতেছে। কিন্তু ভালোর মন্দের অভিনয় সংসারে কদাচ কখন চোখে পড়ে। যেখানে পড়ে, সেইখানেই অভিনয়ের কারিকুরি মার পাঁচ সহজেই ধরা যায়। উহাতে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়, কেননা উহা নকলের নকলত্ব প্রমাণইয়া দেয়।

আমি সব্যসাচী, আমার বন্ধুকে বেশ করিয়াই তালিম দাখম। আয়না আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিলাম। আয়নায় মুখ দেখিয়া সে নিজেই হাসিয়া আকুল। বন্ধুর হাসি দেখিয়া বুঝিলাম—ঠিক হইয়াছে। বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। লাহোরের প্রাচীন রাস্তা। রাস্তার দুইপাশে বহুকালের জীর্ণ মলিন পাথরের বাড়ী জ্যোৎস্নায় আরও কুৎসিৎ দেখাইতেছিল। শুনা যায়, জ্যোৎস্না রজনীতে এই সব জীর্ণ মলিন ভগ্ন অট্টালিকা এক অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু সে কাব্যের কথা, স্মৃতির কথা, কবিতায় আর বাস্তবে ঢের তফাৎ।

নকল পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবীদের বেহায়া বেহুঁরা চীৎকার, এক্কার ঝক্ঝক ছড় ছড় শব্দ, ফেরিওয়ালার বীভৎস আওয়াজ,—একটা তুমুল বেহুঁরা হৈ চৈ গোলমাল! রাস্তার দু'ধারে ছোট খোট দোকান মলিন ধূলিপূর্ণ, কেরোসিনের মিটমেটে আলোয় চোরের মত মিট মিট করিয়া চাহিতেছে। সে আলো হইতে অনর্গল ধূম উঠিতেছে, যেন আপনাকে ঢাকিতে পারিলে বাঁচে। একটা বিশ্রী গন্ধ খাবারের দোকানগুলি হইতে কেরোসিনের ধূয়ার গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত রাস্তাটাকে একটা বিশ্রী কাণ্ডকারখানার আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু পাঞ্জাবী ভায়া মহা আনন্দে চলিয়াছেন। লোলুপ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সেই সব ধূলিমলিন হরেক রকম বিদ্যুটে লাড্ডুমণ্ডিত খাবারের দোকানগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে। কণ্ঠে যুহু যুহু গান—

“আও আও নগরীয়া হামারী

চলবো কাঁয়সে ডগবু নেহি জানী।”

তারপর ফাঁকা ঘায়গা। বর্তমান লাহোর। চাঁদ হেথায় হাসিতেছে, চাঁদের আলোতে সকল হাসিতেছে। ছোট বড় বাংলো—ফাঁক ফাঁক রাস্তার দু'পাশে রেলিং ঘেরা বাগান, বাগানে লতা পাতা গাছ সাজানো গোছানো। মাঝে মাঝে

বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত কোন কোন বাংলায় পিয়ানো অরগান্ বাজিতেছে, আলোকে, সুরে কল্পনায় গৃহের ছবি আরও মনোরম হইয়া শোভা পাইতেছে।

কিছু দূর এমনি গমনের পর বন্ধু তেমনি এক বাংলার সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই পাশে দুইটি গেট। একটি গেট হইতে ভিতরে একটি কাঁকরবিছানো রাস্তা একটি নাতিবৃহৎ অণ্ডাকৃতি লন্ বেঠেন করিয়া অপর গেটে আসিয়া মিশিয়াছে। সবুজ লন্, সুন্দর ছাঁটা। লনের পশ্চাতেই বাংলা বাড়ী বৈদ্যুতিক আলোতে ঝল গল।

পাঞ্জাবী হাসিতে হাসিতে লন্ পার হইয়া ফুলের টবে সাজানো আলো-ঝলগল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—

“বাবু!”

ঠাকুরদা নাত্নী এবং মোহিত সহ তেমনি আলোকিত চল ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাক শুনিয়াই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নাত্নীর পাত্ৰকে সাদরে কক্ষের ভিতর লইয়া গেলেন এবং মোহিত এবং নাত্নীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, “ইনিই পাঞ্জাবী পাত্ৰ, বহু অনুসন্ধানে খুঁজিয়া অনেক সাধ্যসাধনায় বাঙ্গালী মেয়ে বিবাহ করিতে সাজি করিয়াছি।”

নকল পাঞ্জাবী

তারপর নাতনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

“দিদি, তুমি এর সঙ্গে পরিচয় কর ।”

পাঞ্জাবী দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ ছিলনা । ‘দিদি’ শ্রিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ইংরেজি কেতা অনুসারে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল । কিন্তু পাঞ্জাবীর সে দিকে হুঁস্ নাট । সে মুগ্ধ হইয়া দিদিকেই দেখিতেছে । দেখিতে দেখিতে বলিল,—

“ইয়ে আস্‌লি রং কি নকলি ?”

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

“নেহি বাবু, নেহি । আস্‌লি রং, হাম্‌ পানিমে ধোকে দেখ্‌লানে সকতা ।”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“হক্‌ ।”

দিদি সেক্‌হ্যাও না করায় অপ্রতিভ হইয়া হাত তো গুটাইয়া লইয়াছেই, আবার তাহার মুখের রং আসল কি ফলানো জিজ্ঞাসা করায় যে কি আগুন লাগিয়াছে, তাহা তাহার গণ্ডের রক্তিম আভা দেখিয়াই বুঝা গেল । চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল ।

পাঞ্জাবী বলিল,—

“হক্‌ ! মেরা পছন্দ । রুপিয়া দেও ।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“রূপেয়া ?—হাঁ—ও তো জরুর দেগা, সাদিকা পিছে ।”

পাঞ্জাবী শির সঞ্চালন করিয়া বলিল,—

“নেহি, আধা আভি চাহি ।”

নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করিল,—

“কিসের টাকা, দাদামনি ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“সে কথা তোমার শুনে দরকার কি, দিদিমনি ?”

“বল না—বল না ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“এঁকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তবে বাঙ্গালী বিয়ে করবেন ।”

নাত্‌নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

“দাদা, দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা অসভ্য জংলী—”

বলিয়াই জিভ্‌ কাটিল ।

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“দিদি, টাকার কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে চিরকাল ঘর-ঘরকন্না করতে হবে, তার পরিচয় আগে নাও,—নাম কি জিজ্ঞেস কর না ?”

নাত্‌নী জিজ্ঞাসা করিল,—

নকল পাঞ্জাবী

“আপ্কা নাম ?”

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

“হামারা নাম—পিয়ারী শঙ্কর ।—তোমরা নাম ক্যা ?”

এই অসম্মানসূচক সম্ভাষণে সে মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল ।

নাতনী সুন্দরী বটে ! যেরূপ ভাবে চেয়ারে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, মনে হইল, যেন সিংহাসনে মহামহিমাম্বিতা রাজরাজেশ্বরী !

পাঞ্জাবী বন্ধু কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়াই বলিল, “ক্যা তোমারা নাম ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“বল না, দিদি, নাম বল—নাম বল । এখনি হয়তো চটে চ’লে যাবে !”

ঠাকুরদাই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন,—

“ইস্কা নাম মিস্ বেলা রায় ।”

পাঞ্জাবী হঠাৎ হাসিয়া উঠিল । বলিল,—

“হা—হা—হা—বড়া মজাদার নাম—হক্ হক্ !—বিল্লী রায়—বিল্লী রায়—”

পাঞ্জাবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল । মোহিত এতক্ষণ অদূরে বসিয়া পাঞ্জাবীর কীর্তি দেখিতেছিল । পাঞ্জাবীর এই কথায়

প্রথম প্রস্তাব

রুমাল মুখে গুঁজিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে লাগিল। তাহাতে পাত্রী আরও যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদা বলিলেন,—

“দিদি, বস।”

নাতনী বসিল। পাঞ্জাবী আবার বলিতে লাগিল,—

“মিস্ বিল্লী রায়—এ বড়া মজাদার নাম—হুক্ !—কেঁউ ? কুল্ মছলি খাতে হো !”

পাঞ্জাবী হাসিতে লাগিল। পাঞ্জাবী শুনিতে না পায়, এক্রপ অক্ষুটস্বরে নাতনী বলিল,—

“তোমারা মুণ্ডো খাতে হো।” কিন্তু পাঞ্জাবীর তীক্ষ্ণ চক্ষু কর্ণের কাছে কিছুই এড়াইল না। ঠাকুরদা যেন বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া সেই সময় নাতনীর পাশে বসিলেন, এবং তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

“দিদি, রেগো না, রেগো না ; হাতছাড়া হ'লে আর এমন সুপাত্র পাওয়া যাবে না। একে যেমন ক'রে হোক পোষ মানাতে হবে, ওকে খুসী ক'রে দাও, তা হ'লেই বস্।”

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া নাতনী নীচুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

“টাকা কি তুমি দিয়েছ না কি ?”

নকল পাঞ্জাবী

“না দিইনি, কিন্তু অর্ধেক এখনি দিতে হবে।”

নাতনী বলিল,—

“হ্যা—টাকা দিতে হবে, না ওর পিণ্ডি দিতে হবে!”

ঠাকুরদা যেন তাহা সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—

“দিদি, তোমার একখানা গান গেয়ে ওঁকে খুসী ক’রে দাওনা?”

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

“হা—হা—হা—গান্—গান্—ক্যা? অংরেজি বোলতা কেয়া বাংলা বোলতা? হাম ভি খোড়া খোড়া বাংলা জান্তা, অংরেজি ভি জান্তা। অংরেজি মে গান্ কো বোলতা—কামান্।”

নাতনী হতাশভাবে পাত্রের মুখের পানে চাহিল। ঠাকুরদা উৎসাহিত করিতে লাগিলেন,—

“গাও, দিদি, গাও।”

“হা—হা—হা—গৌ গৌ—হামারা বহুৎ গৌ হাঁয়—হক্!”

নাতনী তেমনি চুপি চুপি বলিল,—

“হাঁয় তো তুই তাদের দল ছেড়ে এখানে মরতে এলি কেন রে মড়া?”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“হাম্ মরা নেই—হাম্ জিতা—নাম পিয়ারী শকর—
হক্—আচ্ছা, তোমারা যো খুসী, ওসি বোলো, বিবি।”

নাতনী একটু চটিয়া বলিল,—

“দেখ্লে দাদামণি, দেখ্লে, আমায় বল্লে কিনা
বিবি?”

ঠাকুরদা একটু মুচ্কি হাসিয়া নাতনীর পিঠে হাত
বুলাইয়া বলিলেন,—

“দিদি, তুমি বিবির মতো ফুট্ ফুটে কিনা, তাই বল্ছে।”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—বাইজীকো মাফিক্—ফট্ ফট্—হক্!”

“দাদামণি, শোনো, ওকে যদি টাকা দাও, আমি কুক্কেত্র
করব।”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“কা বোল্তা?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“আপ্কে দেখ্কে বহুৎ খোস্ হো গিয়া—ওহি বাৎ
বোল্তা।—দিদি, লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস কর না?”

“আমার দায় পড়েছে! তোমার গরজ হয়, তুমি
কর।”

পাঞ্জাবী বলিল,—

নকল পাঞ্জাবী

“কা ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মিস্ বেলা বোলতা হয়—”

পাঞ্জাবী বাধা দিয়া ধম্কাইয়া বলিল,—

“হক্ নাম বলো—বিল্লি—মিস্ বিল্লি—কেয়া, মছ্‌লি
খানে মাংতা হয় ?”

এই পরিহাস করিয়া পাঞ্জাবী বন্ধু এক গাল হাসিয়া
ফেলিল ।

ঠাকুরদা সকল দিক সাম্‌লাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“আপ্‌কো পড়াশুনা কেত্‌নে তক্ ?”

“পরশুন ক্যা ?”

ঠাকুরদা পরশুন্‌ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—

“আপ্‌কো বিদ্যা ? ষেস্‌কো লার্নিং বোলতা ?”

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্ !—(Knowledge) নোলেজ্—
বহুং হয়—হক্ ! খেত্‌কা কাম্‌ জান্তা—গৌ পাল্তা—নৌ
টান্তা—হক্ !”

“ওমা, মুখপোড়া বলে কি, দাদামণি ?—বলে নৌ
টান্তা ! মিন্‌সে নৌকার মাঝি নাকি ? তাড়াও, তাড়াও,
দাদামণি, এখনি তাড়াও ।”

“হাঁ—হাঁ—তালাও ভি হামারা হাঁয়—দো চারঠো হয়—

হক্—হুয়া, বহৎ মছলি হাঁয়, তোম্ খুব্ খাগা!—হক্ ।
তোম্ বিল্লি হায়—হক্ !”

“দাদামণি, তুমি কি একটা খুনোখুনি করবে ? কি রকম হক্ হক্ করছে, বল দেখি ।—আমি মোহিত বাবুর কাছে গিয়ে একটা কথা কইব ।”

ঠাকুরদা টাকশুক মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন,—

“মোহিত তো কাছেই আছে, যখন ইচ্ছে কইতে পারবে, এখন এ যদি দেখলে চটে যায় !”

“ওর চটার কপালে আগুন ! চোটে থাকে, ঘরের ভাত বেশী ক’রে খাবে !”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“নেই—ভাত হাম্ নেহি খাবে । কুল্ ডাল রোটি খাবে । (সুর করিয়া)

মোটি মোটি ডাল্ রোটি

ছোটি ছোটি চানা

তাজ্জব কি কারখানা ।”

বেলা অবাক্ হইয়া পাঞ্জাবীর মুখ চাহিয়াছিল, তাহার গান শেষ হইলে বলিল,—

“ওমা কি হবে ! ডাল্ কটির নামে মিন্দের মুখ দিয়ে লাল পোড়লো গা ! রাম রাম, কি ঘেরা ! দাদামণি, তোমার

নকল পাঞ্জাবী

পায় পড়ি, আমার হাত ছাড়— মোহিত বাবুর সঙ্গে একটা কথা
কই।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“আর কি কথা? সেই পাঞ্জাবী মেয়ের কথা তো?
আমি তো এখনো খুঁজে পাইনি, আচ্ছা, এঁকেই জিজ্ঞেস করি
না কেন?—বাবু পিয়ারী শঙ্কর, আপ্ কোই এসি লেড়কী কো
জান্তা, বাঙ্গালীকো সাদী করে গা?”

পাঞ্জাবী টেবিল চাপ্ড়াইয়া হাঁক ছাড়িয়া বলিয়া
উঠিল,—

“কাঁহে নেই—আল্‌বাৎ হোনে স্কৃত্তা—রুপেয়া সে
সব্ হোনে স্কৃত্তা। রুপেয়া দেও, লেড়কী দেগা। হামারা
ভি তিনঠো হায়—”

“ও দাদামণি, শোনো, শোনো, বলে, তিন্ঠো লেড়কী
আছে!”

“হাঁ—আছে তো বাইজী—হক্—হামারা পয়লা জরুকা—”

“ও দাদামণি, আবার পয়লা জরু, কি বলে? তুমি কি
আমায় হাত পা বেঁধে জলে ডোবাবে? ওকে বিদেয় কর,
বিদেয় কর।”

“হাঁ—হাঁ—বিদ্যে কো বাৎ তো বহৎ ছয়া—আউর ফিন্
বিদে বিদে, ক্যা করতা?”

প্রথম প্রস্তাব

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন, “নেহি বাবু, আপুকে বিছাকা বাৎ শুনুকে মিস্ বেলা কা বহুৎ তাঙ্কব লাগা—সোই বোলতা।”

“আচ্ছা—আচ্ছা—হক্ । হাঁ—লেড়কী—হামারা পয়লা জরুকা একঠো, দোসরা জরুকা দোঠো—”

“ও আমার কপাল ! মিনুসে কি গাঁশুদু বে করেছে না কি ? তবু আবার বে করবার জন্তে এসেছে ! ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার —”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“নেই—ঝুট্, নেই—হক্” বলিয়াই পাঞ্জাবী আঙ্গুল গণিতে গণিতে বলিল,—

“একঠো ছয় বরষ্, উমর, একঠো তিন বরষ্, আউর একঠো দো । ছয় বরষ্কা ছয় হাজার রুপেয়া, তিন বরষ্কা আশ্তে লেগা তিন হাজার, আউর দো বরষ্কা আশ্তে দো হাজার ।”

“দাদামণি, তোমরা দরদস্তর করতে থাক—”

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্—এই সি দস্তর—এই সি দস্তর । যেৎনা বরষ্, উমর ওৎনা হাজার রুপেয়া ।”

“দাদামণি, আমায় ছেড়ে দাও ! -মোহিত বাবু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

নকল পাঞ্জাবী

দাদা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিলেন,—

“তুই তো বড় মজার লোক দেখছি! আমি সাধ্যসাধনা ক’রে আনলুম, এখন তুমি চললে? তা হবে না, আজ ঠুকে এখানে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে, তোমাকেই যত্ন আয়ত্তি করতে হবে।”

“আর খাবে কি, দাদামনি, আমাকেই খেতে এসেছে! মোহিত বাবু! তুমি উঠবে কি না, বল?”

পাঞ্জাবী ঘাড় দোলাইয়া বলিল,—

“উঠ্—হামরা ভি উঠ্ হায়—খুব ছুট্‌তা—হক্।”

“আমার মাথামোড় খুড়তে ইচ্ছে হচ্ছে! কথা বোঝো না, একে এনেছে বিয়ে দিতে?”

“সে কি দিদি, আমার দোষ? তুমিই তো পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী করলে? আপনি ক্ষেপেছ, মোহিতটাকেও ক্ষেপিয়েছ! ও এখন আবদার নিয়েছে, পাঞ্জাবী মেয়ে না হলে বিয়েই করবে না।”

শুনিয়া বেলা ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“কি বল দিদি, ঐ ছ’ বছরেরটাই নেয়া থাক্?—
মোহিত, কি বল?”

মোহিত গম্ভীর হইয়া বলিল,—

“আমি আর কি বলব ? আমি এত দিন যে আশা পোষণ করেছিলুম, তা তো নিশ্চল হয়েছে ! যার জন্তে আমি সব করতে পারি, তাকে সন্তুষ্ট করা আর কি বেশী কষ্ট ! সে যেন আমার মুখ চাইলে না, কিন্তু আমি তো তা পারব না । সে যাতে সুখী হয়, তাই করবো ।”

বলিয়া মোহিত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল । বেলায় চোখ দুটিতে যেন একটু ছল্ ছলে ভাব দেখা গেল । কিন্তু কেবল মাত্র বলিল,—

“মোহিত বাবু, তুমি কি ক্ষেপেছ ?—দাদামণি, তুমিও ক্ষেপেছ ! আমি অন্তায় বায়না নিয়েছি বলে, তোমাদের তাই করতে হবে ? আমি যদি এখন বলি, আমায় বিষ এনে দাও, আমি খাব—”

“নেই বিল্লি বিবি, নেই—বিস্ নেই—ওহি ছয় হাজার মে হো যাগা ।—হক্ ;”

“মোহিত বাবু, তুমি বুঝতে পারছনা ? মিসের আক্কেল নেই, কি শোনে কি বলে—মাথামুণ্ডু—”

“ক্যা ?”

“ওই শোন, থেকে থেকে ক্যা ক্যা করছে, আর হক্ হক্ করছে ।”

ঠাকুরদা টাকে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—

নকল পাঞ্জাবী

“কি করবে দিদি, তোমার যেমন খেয়াল !”

“দাদামণি, তোমার পায় ধরছি, আর তোমার কথার অবাধ্য হব না, তুমি ও মিন্‌সেকে তাড়াও ।—ছিঃ—বল্‌ছে বিল্লি—বিল্লি—বিল্লি—আমার নামের উপর ঘেমা ধরিয়ে দিয়েছে !”

বলিয়া মিস্ বেলা অতি সক্রমণ নেত্রে মোহিত বাবুর মুখপানে চাহিয়া সহসা উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—

“মোহিত বাবু, দাদামণি পাগল হয়েছে ।—তুমি আমায় রক্ষা কর ।”

মোহিত বলিল,—

“বেলা, আমি রক্ষা করবার কে ? যদি সে অধিকার আমায় দিতে, আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতুম—তোমার পায় কাঁটাটি ফুটতে দিতুম না । কিন্তু এখন আমি কে, বেলা ? এখন যে তোমায় রক্ষা করবে, সে ওই ।”

বেলা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মোহিতকে বলিল,—

“আমায় রক্ষা কর !”

মোহিত তেমনি একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

“আমি রক্ষা করবার কে ?”

“তুমি কে !—তুমি সব । আমি যদি একটা ভুল বুঝে থাকি, তুমি কেন আমায় শাসন করলে না, ধম্‌কালে না ?

প্রথম প্রস্তাব

মোহিত বাবু, আমার সর্বনাশ হতে বসেছে, আর তুমি চুপ্ করে বসে আছ? দাদা আমার দুঃখ বুঝে না, উনি এতো দুঃখ পেয়েছেন, আর দুঃখ ধরবার স্থান ঠুর হৃদয়ে নেই, তাই উনি হেসে খেলে নেচে কঁদে বেড়ান, আমি কি বুঝি নি? কিন্তু তুমিও কি বুঝবে না?”

“বোঝাবুঝি তো ফুরিয়েছে, বেলা।”

“কেন ফুরিয়েছে?—কিছু ফুরায় নি! তুমি আর একবার বল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।”

“আমি আর বলবার কে? যে বলবে, সে তো তোমার সামনে উপস্থিত, আমি তোমার কে?”

“অভিমান করেছ? আমায় তিরস্কার কর, পদাঘাত কর, কিন্তু আমায় ভাসিয়ে দিয়ো না। তুমি আমার কে! আচ্ছা, আজ তুমি এ কথা বললে, কিন্তু এই বুঝে কি থাকতে পারবে? ভাল, তাই ধরলুম, তুমি অভিমানে পাষণ হয়েছ!—তুমি আমার কে?—ভাল তাই—তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু আমি কি তোমার কেউ নই? আমি ছেলেবেলা থেকে মা জানিনি, বাপ জানিনি, জানি কেবল দাদামণিকে আর তোমাকে! আমার একটা খেয়ালের কথায় রাগ ক’রে আমায় ভাসিয়ে দিচ্ছ! কিন্তু এ খেয়ালের প্রশ্ন কে দিয়েছিল, কারা দিয়েছিল? আজ তুমি বলছ, তুমি আমার কে? ভাল, তুমি আমার কেউ নও!

নকল পাঞ্জাবী

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কেউ নও, আমিও কি তোমার কেউ নই? যাকে হাতে ক'রে গড়ে তুলেছ, একদিনে তার সঙ্গে সম্বন্ধ উঠিয়ে দিলে কি এমনি করেই উঠে যায়—বল—বল—আমি তোমার মুখে শুন্তে চাই।—বল—আমি তোমার কেউ নই!—আর তোমায় বিরক্ত করব না—দাদামণিকে বিরক্ত করব না—আমি চ'লে যাব—আর কাউকে মুখ দেখাব না।”

মোহিত অধোবদনে বসিয়া রহিল। ঠাকুরদা অধোবদনে চক্ষের জল মুছিতেছেন।

পালাতো এক রকম শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ করিয়া এখান থেকে বিদায় নিতে পারলে হয়। পাঞ্জাবী বন্ধুর যা কাজ, সেতো তা সম্পন্ন করিয়াছে।

ঠাকুরদা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—

“দিদি, রোস্—এটাকে আমি যে রকমে পারি, বিদায় করি।”

পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—

“মিস্ বেলা আপ্‌কো পছন্দ নেহি করতা।”

পাঞ্জাবী চটিয়া উঠিয়া বলিল,—

“তব্‌ যোফ্‌ৎ কাহে হাম্‌কো বোলায়া ? রুপেয়া লেকে তব্‌ উঠে গা।”

বেলা বলিল,—

“দাও, দাও,—ঠাকুরদা, যা চায়, দাও, দিয়ে শীগ্গীর
শীগ্গীর বিদেয় কর ।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“দেখিস্ দিদি, পাঞ্জাবী খেয়াল ছাড়বি তো ?”

বেলা বলিল,—

“দাদামণি, যে নমুনা দেখিয়েছ, পাঞ্জাবী কি, পাঞ্জাব শুক
ছাড়তে রাজি আছি ।”

ঠাকুরদা পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—

“আচ্ছা, রূপেয়া আপ্‌কো পিছে ভেজে গা—কেৎনা
মাঙতে হো ?”

“হামারা সাধ সাদী নেহি দেগা ?—আচ্ছা, গান শোনাও,
নেহি তো হাম নেহি উঠে গা—নেহি চলে গা—আলবাৎ সাদি
করেগা—”

বেলা ভাড়াভাড়ি বলিল,—

“দাদা, যদি মিন্‌সে গান শুনালেই বিদেয় হয়, তা আমি
এখুনি গাচ্ছি—”

বলিয়াই বেলা কক্ষেরু অপর পাশে টেবিল হারমনিয়মে
গিয়া বসিল ।

এই অবসরে ঠাকুরদা য়ুহু হাসিয়া সক্রতজ্ঞ নয়নে আমার

নকল পাঞ্জাবী

দিকে চাহিলেন । আমিও তেমনি হাসিয়া তাঁহার চাহনির
প্রত্যুত্তর দিলাম ।

হারমনিয়ম বাজিয়া উঠিল । বেলা মোহিতের দিকে এক-
বার চাহিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিল—

নারী হ'লে বুঝতে নারীর মন,

অনাদরে কত সহে, বুকে বাজে কি বেদন !

কাতর প্রাণে মুখের পানে চায়,

নীরবে ধারা ব'য়ে যায়,

নীরবে অঁাখি বলে, রাখ রাখ পায় ।

সয় ব'লে কি সওয়াতে হয়, হায় !

ভালবাসার এত খোয়ার

আগে কি জানি এমন !



দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

গভীর রাতে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো !”

কে এ ? কাকে জাগায় ? কেন জাগায় ? এ ধ্বনি তো শুনিতে পাই প্রতিরাতেই উঠে, কিন্তু জাগে কয় জন ?

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো !”

আমি তো জাগিয়াছি, তবে আবার কেন বলে ?—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো !”

সে কি জাগরণ ? মানুষ নিত্য ঘুমায়, নিত্য জাগে, এ কি সে জাগরণের কথা বলিতেছে না ? এ বুঝি বলিতে চায়—
শোনেওয়ালো জাগতে রহো—মোহ-নিদ্রায় আর ঘুমাইয়ো না,
কাল-চোর সর্বত্রই ফিরিতেছে !—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো !”

এমনিতর কতকগুলো চিন্তা আমার মাথার ভেতর উলটি পালটি খাইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ চিন্তা করিবার বয়সও আমার নয়, আর চিন্তাটাও বড় আরামপ্রদ নয়। আমি মায়ে

নকল পাঞ্জাবী

ছেলে, মা'র কোল জুড়িয়া থাকিব, চিরদিন হাসিয়া খেলিয়া
বেড়াইব, আবার ঘুম পাইলে মায়ের কোলে আসিয়া শুইব,
তা তোমার কাল-চোরই আশুক আর খাটি চোরই আশুক,
আমি খোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু বেটার কি সর্ব্বনেশে
হাঁক গো! ঐ, আবার হাঁকে—

“শোনে ওয়ালা জাগতে রহো!”

আমি একলক্ষ শয্যা হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া
পাহারাওয়ালার গলার উপরও সপ্তমে সুর চড়াইয়া হাঁকিলাম—

“ঘুম্নে ওয়ালা নিদ্ যাও।”

পাহারাওয়ালার আমার হাঁকের টানে একেবারে আমার
বারান্দার কাছে আসিয়া মস্ত এক সেলাম ঠুকিয়া বলিল,—

“বাবু সাব, নিদ্ যাই তো কুটি ক্যায়সে মিলে?”

এতা বড় বিপদ দেখিতেছি! ঘুমাইলে বলে—জাগতে
রহো, আর ঘুমাইতে বলিলে বলে—কুটি ক্যায়সে মিলে?
ওবেকি যত জাগাজাগি সব পেটের জন্তু? আমাদের সকল
কাজই কি এই পেটের জন্তু? জীবনের কি আর কোনো
উদ্দেশ্য নাই? কেবল ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ’?”

এক সন্ধ্যা এত চিন্তা আমার কোনো কালে অভ্যাস নাই।
মাথার ভিতর বিম্ব্ বিম্ব্ করিতে লাগিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া
দেখি, রাজিও বিম্ব্ বিম্ব্ করিতেছে—বলে, বিা বিা ডাকিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

কা'কে ডাকিতেছে ? আমাকেই ডাকিতেছে নাকি ? কেন ডাকিতেছে ? আমাকে ওর কি দরকার ? নাঃ—আজ মা যেরূপ জোর ক'রে ক্ষীরের পিঠে খাইয়েছেন, বুঝি সেই জন্তুই পেট গরম হয়েছে, তাই এমন আবোল তাবোল নানা কথা মনে উঠছে, তার উপর আবার নিষ্কর্মা জীবন। আচ্ছা, একটা কিছু করলে হয় না ? একটা হৈ চৈ—যা হয় একটা কিছু ? কিন্তু এই নিশুতি রাত, সব চুপ্, চাপ্, নিশুক্র, সমস্ত লাহোর ঘুমাইতেছে, পথের আলোগুলোও যেন বিমাইতেছে ! এমন নীরব নিশীথে হৈ চৈয়ের চিন্তা মনে বড় স্থান পায় না। চারদিক্কার জমাট বাঁধা নিশুক্রতা যেন যেকে এসে আমার বুকের উপর ব'সছে ! ওঃ—দিনের বেলা কি হড়হড়ানি, ঘড়ঘড়ানি, কি চেঁচামিচি, খোঁচাখুচি হৈ চৈ ! আর এখন সব অঘোরে ঘুমুচ্ছে। যেন এ জগৎ সে জগৎ নয় ! এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যের মাঝখানে আমি সজাগ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি ? মানবজীবন কি বিচিত্র ! জীবন বিচিত্র, মন আরো বিচিত্র ! —আর মনে মনে কি বৈচিত্র্য ! ঘৃণা হিংসা আশা ভ্রম। ভালবাসা—এ সব কি ? কোথা থেকে আসে, কেন আসে ? আসে তো আসে তার জন্তে আমার এত মাথা ব্যথা কেন ? নাঃ—কালরাত্রে ওটমিল (Oat meal) ব্যবস্থা করব। খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকবে, শরীরে বলও হবে, সুনিদ্রা হবে—এমন

নকল পাঞ্জাবী

হাবড়হাটি ভাবতে হবে না। একি বিপদ! ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছেই। এরাও ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে, আর আমারও মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে! হাঁ—কি ভাবছিলুম? আশা তুষা ভালবাসা। এ সব না হ'লে কি মানবজীবন ব্যর্থ? আমি তো মা'র কোলে বেশ সুখে আছি—সত্য, একটা ভালবাসা চাই; হয় আমার মায়ের মতন ভালবাসা, নয় মোহিতের উপর বেলার যেমন ভালবাসা। আচ্ছা, ও ভালবাসা কি রকম? অনেক দিন হ'য়ে গেল সেখানে যেতে কি খবর করতে পারিনি। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে, নির্ঝোঁধ বালিকাকে যে রকম ক'রে ঠকিয়েছি!—যদি চিন্তে পারে? পারলেই বা, মন্দতো কিছু করিনি! ভালই হয়েছে। কিন্তু ও ভালবাসাটা কি রকম? যা ছেলেকে ভালবাসে,—একে বলে বাৎসল্য, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে—তাকে বলে সখ্য, আর স্বামী স্ত্রী, প্রণয় প্রণয়ীতে যে ভালবাসা—সেটাকে বলে দাম্পত্য।—বাবা! নামটা খুব ঘোরালো বটে! কিন্তু তার নামটা কি? আমি তো কিছুই বুঝি না, আমার বোঝবার দরকারও নাই, আমি মার কোলেই থাকব। আবার!—ঐ ডাকে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! তোরা কে রে বাবু?—আমাকে কি ঘুমুতে দিবি নি নাকি?—মৎলবটা কি?—হাঁ, ভালবাসাটা কি রকম! নায়ক নায়িকাতে দেখা হ'ল, আর এ বললে—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

‘আমি তোমার’, ও বললে—‘আমিও তোমার ।’ একথা কেমন ক’রে বিশ্বাস করি ? খামাকা বললে, ‘আমি তোমার’ আর অমনি তোমার হ’য়ে গেল ? কে বাবু, তোমার সাত-পুরুষের কুটুম ? রক্তের টান নেই, আজন্ম দেখা শুনা নেই, চোখাচোখি হ’ল আর অমনি মুখোমুখি হ’য়ে ব’সে বুলি আঙ-ড়াতে সুরু করল—প্রাণনাথ, প্রাণপ্রেয়সী ! এ সব কি সত্যি না মিছে ? এ কি সব অভিনয় করে ? নাটক, থিয়েটার ? হাঁ, আলোচনা করবার মতো কথা বটে ! মাকে জিজ্ঞাস করতে হবে, কা’র ভালবাসা বড় ?—মায়ের ভালবাসা না বোয়ের ? মোহিতের বিয়ে হওয়া অবধি মা আমাকে ভারি পেড়াপিড়ি করছেন—বে কর, বে কর। কেন ? কি দরকার ? খামাকা সুষ্ট প্রাণকে ব্যস্ত করা কেন ? মায়ে ছেলেতে একটা বোঝাবুঝি হ’য়ে গেছে, আবার নূতন একজনকে এনে তার সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়া কর ! সে কি মায়ের মতন ভালবাসতে পারবে ? তাও কি কখনো হয় ! কাল মাকে জিজ্ঞাসা করব, মা কি বলে। যেমন পেড়াপিড়ি কচ্ছে তেমনি এক কথায় চুপ করিয়ে দেব। আর কথখনো বিয়ের কথা মুখে আনবে না।—আবার ডাকে, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—করুগে তোরা ঝিম্ ঝিম্—আমি শুইগে। কে একজন ঝিম্ ঝিম্ শুনে পাগল হ’য়ে গিয়েছিল, দিন রাত লাঠি হাতে

নকল পাঞ্জাবী

ঘুরে বেড়াতে আর ব'লতে "ছত্তোর—ঝিম্ ঝিম্—ঝিঝির
বংশ নির্বংশ করব।" গতিক বড় ভাল নয়! মুখ, রাজ,
স'রে পড়। তোমার ঐ মা-ই ভাল, আর হৈ চৈ ভাল।—
এখন শোওগে, যাও।

২

“খোকা! খোকা!”

আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, বেলা হইয়া গিয়াছে—
রোদ্ৰ উঠিয়াছে! মা তাই ব্যস্ত হইয়া ডাকিতেছেন,—

“খোকা! খোকা!”

“কি মা!”

“ওঠ্ না, কত বেলা হয়েছে দেখ দেখি! আর কত
ঘুমুবি? এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিস্ যে? অস্থখ করেনি তো?”

“অস্থখ করতে যাবে কেন?”

“তবে ওঠ্ শীগ্গীর। কখন চা খাবি? ছ'বার গরম
জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল! কাল রাত্তিরে বুঝি ঘুম হয় নি?”

আমি দেখিলাম, এইবার মায়ের জেরা আরম্ভ হইল।
এক একটি প্রশ্নে আমার মনের সব কথাগুলি একটি একটি
করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইবে। আমি সে কথার উত্তর
না দিইে বলিলাম,—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“মা ! তুমি আর রোজ রোজ অমন ক’রে পিঠে পোলাও রেঁধো না ।”

যাঃ—এই কথায় সবই তো বলিয়া ফেলা হইল !—
বদহজম, মাথাগরম, অনিদ্রা, হাবড়হাটি ভাবনা ।

মা বলিলেন,—

“রাত্রে বুঝি ভাল ঘুম হয়নি তোমার ? কেবল এলোমেলো ভেবেছিস ?”

ইনি কেমন করিয়া যে আমার মনের সকল কথা জানিতে পারেন, আমি বুঝিতে পারি না । আচ্ছা, ঐ দাম্পত্য—সে-ও কি এমনি মনের কথা বুঝতে পারে ? মার কাছে আমার কোনো কথা লুকুতে ভয় করে । মনে হয়, দুটো উজ্জল তীক্ষ্ণ সক্রম চক্ষু যেন আমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছে । কোন কথা লুকাইঘাছি, দেখিয়াছি, মা কেবল হাসিয়াছে । অমনি অপ্রতিভ হইয়াছি । তার পর সত্য মনের ভাব বলিয়াছি ।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিলাম, হাতমুখ ধুইয়া চা ও মোহন-ভোগ খাইতে খাইতে বলিলাম,—

“তুমি কেমন বাপের মেয়ে,—কেমন ঠিক ঠিক বল, বুঝব ।”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“কেন, কি হয়েছে ?”

নকল পাঞ্জাবী

“আচ্ছা মা, ঠিক ক’রে বল দেখি, মায়ের ভালবাসা বেশী কি বোয়ের ভালবাসা বেশী ?”

কি ছুট্টু মেয়ে ! বলিলেন,—

“তুই বে কর না, তা হ’লেই বুঝতে পারবি ।”

আমি আর কথাটি কহিলাম না, চুপ্ করিয়া গেলাম । মনে মনে স্থির করিলাম, ক্লাবে এ কথা তুলিব, দেখি, আমার বন্ধুবর্গই বা কি বলে । মোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে সহজতর পাইব না । বৌ হয়ে ইস্তক ওটা সত্যি সত্যিই ব’য়ে গেছে !



সন্ধ্যার পর ক্লাবে গেলাম । তাইতো, ক্লাবের কথা তো এতক্ষণ বলাই হয়নি । এইখানে তবে একটু পরিচয় দি ।

অনেক রিডিং ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব আছে । সব এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া ক্লাব করে । আমাদের নিরুদ্দেশ্য ক্লাব, সুতরাং ইহার নামকরণ হইয়াছে—ক্লাবিং ক্লাব (clubbing club) ক্লাবিং কথাটার মানে লাঠালাঠি । সে অর্থেও যদি কেহ গ্রহণ করেন, আপত্তি নাই । ডিস্কাসন্ (discussion), ডিবেট (debate) তো হয়ই, তার উপর একটা কথা বলে না ?—হাত থাকতে মুখোমুখি কেন ? যে অর্থেই নিন, আমা-

দ্বিতীয় প্রস্তাব

দের club এর নাম ক্লাবিং ক্লাব । সাত বন্ধু একত্রিত হইবার
অন্ত ক্লাব ।

একগে বলা থাক, ক্লাবে কি কি আছে । উহাতে গীত
বাছের সরঞ্জাম, ছোটখাটো ভোজের এবং সাহেবি ধরণে
খেলার বন্দোবস্ত আছে, তা ছাড়া লাইব্রেরী আছে । কেবল
একটা জিনিষ নাই, সেইটে হইলেই একটি ছোটখাটো বিলাতি
ক্লাব হইত । তবে ভরসা আছে, একদিন তা হবে । যেমন
নরের সঙ্গে নারীর, তেমনি গীতের সঙ্গে নৃত্যের যোগ স্বাভা-
বিক । এই যোগ হইতে নৃত্যটি আমরা বিয়োগ করিয়া
দিয়াছি ।

ঘর এবং বাহির—বাগলায় দুইটা আলাহিদা চিহ্ন ।
পাঞ্জাবে মাত্র একটি সূক্ষ্ম পরদার ব্যবধান । বিদেশে ঘোমটা
থাকে না, থাকিলে অচেনা পথ চলা মুশ্কিল । আমরা প্রবাসী,
আমাদের ঘোমটা নাই ।

ব্যবধান,—নম্রতার, মধুর সন্মিত লজ্জার, আর সসম্মম
আত্মমর্ষ্যাদার, ফুরুফুরে শান্তিপূরের সূক্ষ্ম সূতোর বোনা, ফুর-
ফুরে দারোয়ান নয় । ঘোমটার তলে খেমটা—ওটা বাঙ্গালার
বাঙ্গালীর বোল, লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীর নয় । এ কথাটা
বলিয়া রাখা ভাল, এবং জানিয়া রাখা ভাল ।

এই ক্লাবে ছয়টি ষড়রিপুর মতন আমার ছয়জন সঙ্গী

নকল পাঞ্জাবী

নিয়ত বিরাজ করিতেন। ক্লাবে ঢুকিয়াই দেখি, ষড়রিপুর একটি বাদে পাঁচটি বন্ধু রিপু-বৈদ্যাতিক আলোর নীচে সমুপস্থিত।

দুই জন টেবিলের দুই দিকে দুই খানি চেয়ারে বসিয়া অতি মনোযোগ সহকারে যুদ্ধতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও যুদ্ধ করিতেছে। টেবিলের উপস্থিত দেশলাইয়ের বাস্ক, সিগার কেস, এবং সোডার গ্লাস সাহায্যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইতেছে। একজন বলিল, “ধর দেশলাইর বাস্ক জর্মাণ, এই সিগার কেস ফরাসী, আর এই ভারডুন্।” বলিয়া সোডার গ্লাস দেখাইয়া দিল। দিয়া বলিল, “এখন এই দেশলাইয়ের বাস্ক সিগার কেসকে হটাইয়া দিয়া সোডার গ্লাস অধিকার করবে।”

কি আশ্চর্য! বন্ধু আমার এমন সমঝদার এবং যুদ্ধ-তত্ত্ববিদ হইয়াও একবার ভাবিতেছেন না যে দেশলাইয়ের বাস্ক সোডার গ্লাসে পড়িলে কি দশাটা হইবে! কিন্তু তিনি বলিয়াই যাইতে লাগিলেন,—

“এখন, সিগার-কেসকে হটাইতে না পারিলে দেশলাই কিছুতেই সোডার উপর গিয়ে পড়তে পারবে না।”

শুনিয়াই শ্রোতা বন্ধু বলিয়া উঠিল,—

“কেন? সোডার গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে এলেই হ’ল।”

যুদ্ধবিদ হকার করিয়া বলিল,—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“মূর্খ! একি সত্য সোডার গ্লাস? ওটা একটা পাহাড়,
তার উপর দুর্গ।”

“বটে বটে!”

বলিয়া শ্রোতা সুব বুঝিয়া ফেলিল।

ওদিকে দুইজন ফরাসে বসিয়া। গভীর চিন্তা করিতে
করিতে একজন চোঁচাইয়া উঠিল,—

“এই কিষ্টি।”

বলিয়াই সোৎসাহে ফরাসির নলের পরিবর্তে একখানা
হাতপাখার বাঁট মুখে গুঁজিয়া ফরাসি টানিতে লাগিল। দ্বিতীয়
সতরঞ্চ ভায়া। তখন আরও মসৃণল,—“এই স্বষ্টি।”

বলিয়াই পার্শ্বস্থ ডিবা হইতে পানের পরিবর্তে একটি
বোড়ে তুলিয়া লইয়া গালে পুরিল।

ওদিকে আর একজন এক কোণে বসিয়া এস্রাজে ছড়ি
টানিতেছেন—ক্যা কোঁ, ক্যা কোঁ—বউ আমারে ক্যা কোঁ—
সুতো কেটে ক্যা কিনে দেছে ক্যা—কোঁ—ক্যা কোঁ, ক্যা কোঁ—
তার পর অনেক কষ্টে বাহির হইল—“বাজনা”, তৎক্ষণাৎ
এস্রাজ ভায়া মহা উল্লাসে বেহুদ বেহুয়া গলায় যোগ দিল—
‘উঁহ’, বল আমারে সুতো কেটে, কিনে দেছে ক্যা কোঁ’—
ঘন ঘন মাথা চালিতে চলিতে—‘কিনে দেছে ক্যা কোঁ—কিনে,
দেছে ক্যা কোঁ—বউ আমারে—ক্যা—কোঁ’—

নকল পাঞ্জাবী

দুত্তোর বউ ! বউ এখানেও এসে জুটেছে !—দাঁড়াও !

যুদ্ধের টেবিলে গিয়া 'ভারডুন্ দখল' বলিয়া গ্লাস শুদ্ধ সোডা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ ফরাসে গিয়া সতরঞ্চের ছক্ উল্টাইয়া দিলাম। দিবা মাত্র দুই বন্ধু একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। যিনি পাথার বাঁট টানিতেছিলেন, তিনি ঘন ঘন টানিতে লাগিলেন। যিনি পানের বোড়ে চিবাইতেছিলেন, তিনি সহসা 'থু থু' করিয়া মুখের বোড়েটা ফেলিয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। তার পর এসরাজ ভায়ার কাছে গিয়া তাহার কান ধরিয়া শ্রুত্রে সঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে আমিও গাহিতে লাগিলাম, 'বউ আমারে দাড়ি ছেঁটে—ক্যা কোঁ, ক্যা কোঁ'—

এসরাজ হাসিয়া উঠিল।

আমার ষড়রিপুর একটি রিগু অল্পপস্থিত। যদিও ইহার অল্প-পস্থিতিতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, তবুও ইনি আসিয়া এক-খানি সোফায় শয়ন করিয়া কেবল কবিতা পড়েন—বেশীর ভাগ Shakespear—এবং জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখেন। আমাদের এত তর্ক বিতর্ক হয়, তিনি সে সকলে যোগ তো দেনই না, বরং চোঁচামিচির মাত্রা একটু বেশী উঠিলে দুই কান বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পড়িতে থাকেন। তবু, নিত্য নিয়মিতরূপে যাকে একবার দেখা যায়, তাকে না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“ব্যারিষ্টার কোথা ?”

আমার এই সেক্সপিয়ার বকুটি একটি ব্যারিষ্টার । পাঞ্জাব লোয়ার কোর্টে প্রাক্টিস করেন আর ভেরেণ্ডা ভাঞ্জন । মক্কেল ইহার আক্কেলের মতো একেবারে অশরীরী ।

তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“ব্যারিষ্টারকে দেখ্ছি না কেন ?”

আমার প্রশ্নে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল । তাহা দেখিয়া আমারও মনে একটু আশঙ্কার সঞ্চার হইল, বুঝি কোনো অশুভ সংবাদ আছে । একটু উৎসাহেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কি, জবাব দিচ্ছ না কেন ? তার কিছু অস্থখ করেছে না কি ?”

এসরাজ ভায়া বলিল,—

“না, সে বড় ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে !”

আমি আরও উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কি রকম, কি রকম ? ফ্যাসাদ কি ?”

আবার তেমনি মুখ চাওয়া চাওয়ি । আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—

“তোমাদের ভাব বুঝতে পাচ্ছি না । সে তো নিরীহ লোক, কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে ?”

নকল পাঞ্জাবী

তখন ১নং সতরঞ্চ বলিল,—

“সে প্রেমে পড়িয়াছে !”

শুনিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইলাম, বলিলাম,—

“বল কি ! প্রেমে পড়েছে ! কোথায় ? কি কচ্ছে এখন ?”

যুদ্ধবিদ্ বলিল,—

“করবে আর কি ! খালি বিড় বিড় কচ্ছে, আর মাঝে মাঝে সাপের মতন ফোঁস ফোঁস কচ্ছে ।”

আমি মুখে কেবল ‘ঠিক্ হইয়াছে !’ বলিয়াই তিলেক বিলম্ব না করিয়া সটাং ব্যারিষ্টার বন্ধুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম । বাড়ীতে পৌঁছিয়াই দেখি, বন্ধুর বসিবার ঘরের দরজা বন্ধ । ঠক্ ঠক্ করিয়া দুই তিনবার শব্দ করিলাম । ‘ব্যারিষ্টার, ব্যারিষ্টার’ বলিয়া হাঁকিলাম, কিন্তু কোনই সাড়া শব্দ পাইলাম না । শেষে জোর করিয়া দরজা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিয়া দেখি, বন্ধু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি সোফার উপর পড়িয়া আছেন । সেই সোফাতে, মেজ্ঞেতে এবং সামনের টেবিলের উপর বই, হেঁড়া কাগজ, এবং চুরুটের ছাই ছড়ানো । আমি এই সব দেখিলাম, কিন্তু বন্ধু আমায় দেখিলেন না । তিনি যেমন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন । সোফার উপরের

একখণ্ড ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা রয়েছে—

সহসা হৃদয় মাঝারে আমার

প্রেমচন্দ্র উদয় হলো ।

দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে—

এই পর্য্যন্ত । আমি টেবিল হইতে কলমটা তাড়াতাড়ি কালিতে ডুবাইয়া শেষ লাইনটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম ।—

দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে

কাশিতে কাশিতে বেঘোরে ম'লো ।

লিখিয়াই একটা বিদ্যুটে হাসি পাইল । কবিতার চরণ মিলাইতে পারি, এত বাহাদুর আমি ! এ কথা তো আমি পূর্বে জানিতাম না ! পীরিত দেখছি, বিষম ছোঁয়াচে রোগ ! ব্যারিষ্টার তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই কবি হইয়াছেন আর আমি এই সংস্পর্শের সংস্পর্শে আসিতে না আসিতেই কবি হইয়া উঠিলাম ! আমার হাসিতে বন্ধুর চমক হইল । তিনি অতি কাতর চক্ষে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—

“ওঃ মুখ রাজ !”

“হাঁ—এতক্ষণ চিন্তে পারনি নাকি ?”

“আর ভাই, আমার দফা বফা !”

বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যারিষ্টার তাহার

নকল পাঞ্জাবী

টুপিটা হাত ড়াইয়া মুখের উপর ঢাকা দিল। সে টপ্ হ্যাট (Top hat) ঢাকা মুখের শোভা, যিনি 'রামলীলা' কখনো দেখেন নাই, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বন্ধু থিয়েটারী ডৌলে সে হ্যাটের ভিতর হইতে হাঁড়িটাচার গলায় বলিয়া উঠিল,—

“He jests at scars that never felt a wound.”

বলিয়াই বাংলায় অনুবাদ করিলেন—

ঘা নাই যার দেহ 'পরে,

অস্ত্ৰচিহ্ন ঠাট্টা করে।

ঘুঁটের পোড়নে হাসে গোবর যেমন

বন্ধ্যা কি জানিবে বল প্রসববেদন !

শুধু অনুবাদ নয়, অনুবাদের উপর শেষ দুই লাইন ফাউ। আমি বলিলাম—একটু গম্ভীর ভাবেই বলিলাম,—

“সে তো হ'লো। এখন ব্যাপার কি বল দেখি ?”

“ব্যাপার ?” বন্ধু বলিলেন, “ব্যাপার !—Grievous hurt amounting to homicide !—সাংঘাতিক আঘাত !—মাথায় নয়, পিঠে নয়, পেটে নয়, বুকে নয়, মুখে নয়, হৃদ-পিণ্ডের উপর !”

বলিয়া বন্ধু আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিল,—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“ভাইরে ! আমি মরেছি, মরেছি ! তার রূপের অঙ্ক-
কূপে প’ড়ে আমি মরেছি ! এখন আমায় বাঁচাও !” বলিয়াই
আবার ফোস করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, আর বিড় বিড়
করিয়া বলিতে লাগিল,—

“Oh. Romes, Romes, wherefore

art thou Romes !

Deny thy father and refuse thy name,

And I’ll no longer be a barrister !—

এখানে Romes অর্থে মিস্ গ্যাঙ্গুলী ! হায় ! হায় ! Love’s
Labours Lost !—অর্থাৎ প্রেমের প্রসব বেদনার একেবারে
অন্তিম কাল উপস্থিত ! বন্ধু, আমায় বাঁচাও !”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“এতো আবোল তাবোল বকুছ কেন ? কাল রাত্রে
ঘুমোওনি নাকি ?”

বন্ধু হতাশ চক্ষে চাহিয়া বলিল,—

“ঘুম !—

Macbeth doth murther sleep,

Macbeth shall sleep no more !

Macbeth মানে কি বোঝো ?”

আমি বলিলাম,—

নকল পাঞ্জাবী

“Macbeth Shakespeareএর একখানা নাটক আর কি।—এই বুঝি।”

বন্ধু বলিল,—

“ছাই বোঝো!—এখানে Macbeth অর্থে প্রেম!”

আমি বলিলাম,—

“তা তো হলো। এখন কথাটা কি, বল দেখি?”

বন্ধু বলিল,—

“কথা?—To be or not to be, that’s the কথা।

ও:—ও:—So sweet was ne’er so fatal!—প্রেমের সন্দেশ যে এত কটু তা আগে কে জানতো বল?”

আমি বলিলাম,—

“যাক্, এখন বাজে কথা ছাড়।”

“বাজে কথা! Oh, hard-hearted!—আরে শক্ত হৃদয়!”

সত্যই আমার রাগ হইল। বলিলাম,—

“তবে আমি চল্লুম।”

সে এমন হতাশ কাতর নয়নে আমার মুখের পানে চাহিল যে, আমি আবার বসিয়া পড়িলাম। ভিজ্ঞাসা করিলাম,—

কথাটা কি ভেঙ্গেই বল না? যদি কোনো উপায় থাকে তো করবো। শুধু Shakespeare ঝাড়লে কি হবে?”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বন্ধু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—“Shakespeare ঝাড়বো না
ত কি ঝাড়বো ? ব্যারিষ্টার গ্যান্সুলীর নাম শুনেছ তো ?”

আমি বলিলাম,—

“অবশ্য । কে না শুনেছে ?”

“আচ্ছা, গ্যান্সুলীর একটি কন্যা আছে, তা শুনেছ ?”

“হাঁ, তা-ও শুনেছি । তেমন অপরূপ রূপ শুনেছি
পাঞ্জাবে নাই ।”

“তাকে কখনো চোখে দেখেছ ?”

“না ।”

“তাহ’লে আমার কথা সব বুঝতেও পারবে না ।”

আমি বলিলাম,—

“বলনা গুছিয়ে ।—পারব না কেন ? অমন অধীর হ’লে
চলবে কেন ? যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুলও তো
আছে ।”

ব্যারিষ্টার সবলে আমার হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর-
নয়নে আবার আমার মুখের দিকে চাহিল । আমি বলিলাম,—

“বন্ধু, তুমি আশ্বস্ত হও । যদি তোমার এ বিকারের
কোনরূপ প্রতিকার থাকে”—

সে উঠিয়াই আমাকে জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন
করিল । ঘন ঘন সেক্‌হাও করিয়া বলিল,—

নকল পাণ্ডাবী

“Canst thou not minister to a mind diseased ?”

আমি চটিয়া বলিলাম,—

“দেখ, তুমি ওরকম করলে আমি কিছুই করতে পারব না।”

সে বলিল,—

“করবে ?”

আমি বলিলাম,—

“তুমি কি তার সন্দেহ কর ? তুমি যদি জলে ডুবতে চাও, আমি দড়ি কলসী যোগাড় করে দেব না ? এ কি কথা ? এখন বল, কোথায় সে রূপসীকে দেখলে।”

“পার্কের। একদিন সন্ধ্যার পর খুব টান উঠিয়াছে, আর মিঠে মিঠে বাতাস বইছে। সুন্দরী বাপের হাত ধরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। তার পরদিন সকাল বেলা আমি অমনি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান প্রদান করতে গেলুম।

“কেন ? গ্যাঙ্গুলীকে কি এতদিন কোর্টে সম্মান প্রদান করা হয় নি ?”

“আরে, তুমি ত ভারি বোকা ! তিনি practice করেন—High Courtএ, আমি করি, Lower Courtএ—দেখা-শুনা হয়নিতো ! আর হবেও না। যা হোক, গ্যাঙ্গুলী

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তখন বাড়ী ছিলেন না। এই সুন্দরী—এই অপ্সরী—এই কিন্নরী—এই ছরী—এই পরী—যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন ! বন্ধু, তুমি স্বর্গের বাজনা কখনো শুনেছ ?”

আমি বলিলাম,—

“না।—শপথ করিয়া বলিতে পারি—না। সে কি রকম ?”

“সে ঐ সুন্দরীর স্বর যে রকম। সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে কপাল কঁচুকে একটু বিরক্তভাবে বলিল,—

‘আপনি কা’কে খোঁজেন ?’

বাস্, এই হ’য়ে গেল আর কি ! আমি বলিলাম,—

“আমি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান দেখাতে এসেছি।’

তিনি বলিলেন,—

আজ তাঁর দেখা পাবেন না, কাল আসবেন।’

“কি করি, আর অপেক্ষা করতে পারলুম না, চলে এলুম।’

কিন্তু চ’লে আসতে আসতে একবার ফিরে দেখলুম যে, আমার অভিসার ব্যর্থ হয় নি, সুন্দরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করছেন। এমনি ক’রে, যাওয়া আসা শুরু হ’ল। কিন্তু গ্যাঙ্গুলীর সঙ্গে আর দেখা করলুম না। শুনলুম সে বড় খামখেয়ালী লোক, হয় ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে দেবে না। ক্রমে, লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে আসতে, বুঝলুম, মিস্ গ্যাঙ্গুলী

নকল পাঞ্জাবী

কবিতা ভালবাসেন, ফুল ভালবাসেন, আর তার আনুসঙ্গিক
যত কিছু আছে—অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, ছোৎস্না, চাঁদের
আলো, সবই ভালবাসেন। ভায়া এতকাল ধরে আইন
পড়লুম, লাহোরের অলিগলি মক্কেল খুঁজে খুঁজে মরলুম, কিন্তু
মিস্ গ্যাঙ্গুলীর হৃদয়ের ভেতর ঢোকবার পথ যে কোন্ দিক
দিয়ে, তা টের পেলুম না। একদিন হঠাৎ সে দরজা খুলে
গেল!—”

এদের কোর্টশিপের গল্পটাও বেশ জমে আসছে, আমারও
শুনিবার কৌতূহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমি খুব আগ্রহে
স্বীকৃতিসা করিলাম,—

“তার পর, তার পর ?”

ব্যারিষ্টার বলিল,—

“আমি আনাগোনা করতুম ; বুড়ো গ্যাঙ্গুলী যখন বাড়ী
থাকত না অর্থাৎ কোর্টে বেরতো। অমনি রোজ যাই আর
চপলার সঙ্গে প্রেমালাপ করি। মিস্ গ্যাঙ্গুলী থাকেন, আর
তাঁকে মানুষ করেছিল এক বুড়ী দাই, সেই থাকে তাঁর
পাহারা। একদিন গিয়ে দেখি, মিস্ গ্যাঙ্গুলী গান কচ্ছেন,
আমি আশ্বে আশ্বে গিয়ে ঘরের কোনে প্রকাণ্ড হারমোনিয়ম-
টায় বসে গেলুম, আর, তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে
লাগলুম। তিনি বিভোর হইয়া গাইছিলেন, আমার বাজনার

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সঙ্গে তাঁর গাইবার উৎসাহ শতগুণে বেড়ে গেল। এইতেই বুঝতে তো পারছ, আরো কি বলতে হবে ?”

আমি বলিলাম,—

“হবে বৈকি ? আমি ও সব ভাল বুঝিনে।”

“তবে কি ছাই বোঝো ! শোনো, তিনি গান গান, আমি তাঁর মুখপানে চেয়ে বাজাই, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি ! তার পর, একদিন হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

‘আপনি কোর্টে যান না কেন ?’

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলুম,—

‘কোর্ট বড় না কোর্টশিপ্ বড় ?’

দেখলুম, মিস্ গ্যাঙ্গুলী যে অত গোলাপ ভালবাসে, তার মানে আছে। আমি তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা প্রত্যক্ষ করলুম। বুঝলুম যে, আমার ঔদ্ধত্য তাঁর অপ্রিয় হয়নি, কান্দালকে একবার শাকের ক্ষেত দেখালে, তাকে সামলানো দায় !—জান তো ? তোমরা জানতে, আমি ভালমানুষটির মতো নিত্য আদালতে যাচ্ছি ; এখন বুঝছো, কোথায় যেতুম।

ক্রমে একদিন বিবাহের কথা তুললুম। চপলা চকিত্ত হয়ে, ঘাড় হেঁট করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন—

“হায়রে বসন্তে যথা—

নকল পাঞ্জাবী

শ্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম কাননে !”

এখানে “কুসুম-কানন” মানে ডি, পি, চট্টরাজ—
(D. P. Chatteraj)—হায়রে প্রবল বাড়ে যেমন চালের
মটকা উড়ে যায়, সেই দীর্ঘশ্বাসে তেমনি ডি, পি, চট্টরাজের
আশা বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ !”

বলিয়া সে একেবারে এমন ক’রে ঠোঁট ছুঁট চেপে বসলো
যে আমার মনে হ’ল, আর জীবনে সে মুখ খুলবে না !

আমি সহানুভূতিসূচক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা
করলুম,—

“তারপর ? আশা বাড়ী তো ভূমিসাৎ !—”

“তারপর আমিও কূপকাৎ ! বন্ধু, ডি, পি, চট্টরাজকে
আর তোমরা দ্বিজপদ চট্টরাজ ব’লে ডেক না—ডি পি এখন
দ্বিজপদ নয়—ডিসাপয়েন্টেড্ (Disappointed) কিম্বা
ডেস্পেরারিং (Despairing) । চট্টরাজ অর্থে লাভার
(lover) অর্থাৎ Disappointed or Despairing lover—
কি না ‘হতাশ-প্রেমিক’ ।”

আমি বলিলাম,—

“ভাল, হতাশ প্রেমিক ! তুমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে
একেবারে হতাশ হয়ে পড়ছ কেন ?”

সে বলিল,—

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“ভাইরে, বন্ধুরে, প্রাণের তারিণী শঙ্কর রে, আমার প্রাণের প্রাণ “মুখরাজ্” রে, সরলা বালা যখন বিবাহের কথায় একেবারে বিরহের লক্ষণ প্রকাশ করে ফেলে, তখন জান্বে, ভিতরে একটা গোলযোগ আছেই আছে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কে সে সৌভাগ্যবান্, যার জন্তু আমায় প্রত্যাখ্যান করুছ ?”—এখানে সৌভাগ্যবান্ অর্থে হতভাগা। তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। বললে—‘আমি আর কাউকে ভালবাসিনি।’—‘আর’—এই ছোট্ট ‘আর’ কথার যে এত মানে হ’তে পারে তা কোন অভিধানে পাবে না। এখানে ‘আর’ মানে ডি পি চট্টরাজ কিন্তু এবার Disappointed নয় দর্পিত চট্টরাজ অর্থাৎ চট্টরাজ ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসিনি। ভাবলুম, আমাকে ভালবাসে অথচ বিবাহের বেলা চুপ্! অবশ্য তার মানে আছে, কিন্তু কুমারী চপলা তা বুঝিয়ে বলতে অক্ষম। আমি সেই বুড়ী দাইএর স্মরণাপন্ন হলাম। তাকে বললুম—“দাই মা।”

মাতৃ সঙ্ঘোধনে সে গ’লে গেল, অমনি তৎক্ষণাৎ দশটাকা প্ৰণামী পায় নয় তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—“চপলার বিবাহের কি হচ্ছে ?”

সে বললে,—

নকল পাঞ্জাবী

“এই লাহোরে কে একজন দ্বারিক প্রসাদ চট্টরাজ আছে, তার সঙ্গে সঙ্ক ঠিক হচ্ছে।”

সেখানে যদি একখানা চেয়ার না থাকত, আমি মুচ্ছা যেতুম। দাই আমার অবস্থা ঠিক বুঝলে না, বলে যেতে লাগল।

“সেই দ্বারিক প্রসাদের অনেক টাকা কি না? চপলার বাপ মিন্‌সে এত রোজগার করে, তবু টাকার খাই মেটে না। দু’হাতে খরচ করে কি না? এক দিক দে তোকে, একদিক দে বেরোয়। নিজেকে তো কিছু রেখে যেতে পারবে না, তাই ঠাউরেছে—ওই টাকার কাঁড়ির সঙ্গে চপলার বে দেবে। নাতি-নাতনী হবে সিকি-দু-আনী! মেয়ের একটা হিল্লো ক’রে যাবে। সে ছোঁড়া আমার চপলাকে কোথায় দেখেছিল, জানিনি। সে একেবারে বুঁকে পড়েছে। তাকে লোক পাঠিয়ে ছিল। চপলার বাপ বলেছে—“যদি সে আমার মেয়েকে তার সব টাকা—বিষয় সম্পত্তি লিখে পড়ে দেয়, আর আমার বাড়ীতে এসে ঘরজামাই হয়ে থাকে, তবে তাকে নিজেকে আমায় চিঠি লিখতে বোলো। তাকে দেখে তার সঙ্গে কথা ক’রে যদি আমার মেয়ের পছন্দ হয়, তো -তাকে মেয়ে দেব। মিন্‌সেই এমনি টাকার ঝাঁক। সে পাত্তোর কেমন, একবার চোখে দেখলে না! তার খুব টাকা আছে শুনেই নেচে উঠেছে।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ধারিকাকে যে আমি চিনি, সে কথা বলিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“তার চিঠি এসেছে? সে ঘরজামাই থাকতে রাজি?”

দাই বললে,—

“ঐ খানেই গোল বেধেছে। সে-ও মায়ের এক ছেলে, ঘর জামাই থাকু'বার জন্তু মা'কে রাজি করতে পারুছে না। তা বাবা, সে মা'র আদুরে ছেলে, মা কি তার আব্দার না শুনে পারে? হয় ত মাগী শুদ্ধ এসে ছেলের সঙ্গে বেই বাড়ীতে বাস করবে।”

ভায়া, সেদিন যে চপলাকে “শুড্ বাই” ক'রে চলে এসেছি, আর সেখানে ঘাইনি। এক একবার রাগ হয়, ধারিক ব্যাটার নামে criminal mis appropriation এর চার্জ্ আনি।”

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম—

“Criminal misappropriation!”

বন্ধু বলিল,—“নয়? সেই কলে কিষ্টে ধারিকে বেটা চপলাকে আত্মসাৎ করবে? আর বড়ো ব্যাটা তাতে Aiding and abetting?” শুধু criminal mis appropriation!— টাকার লোভ দেখিয়ে চপলাকে ‘co-ercion’ করুছে। তার পর ধর, এতে আমি ক্ষেপে যেতে পারি, খুনোখুনি করতে পারি, বাঁ ক'রে একটা ব্রিচ্ অব্দি পাবলিক্ পিস্ (Breach of the

নকল পাঞ্জাবী

public peace) হ'তে পারে ! and whoever commits an act likely to endanger public safety—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

“আরে থাম, থাম !”

“থাম্ব ! আচ্ছা, তোমার কথায় থাম্‌লুম, কিন্তু A horse ! A horse ! my Kingdom for a horse !—
এখানে horse অর্থে চপলা গ্যাঙ্গুলী । মিস্ চপলা গ্যাঙ্গুলী কবিতা ভাল বাসেন, তাই কবিতা লেখা অভ্যাস করেছি ।
তুমি যদি আমার ‘পোড়া সলুতে,’ ‘চাম্‌চিকের বিলাপ,’ ‘কাকের অবৈধ জনতা,’ ‘ছিন্ন পুঁটুলি,’ ‘খোলামকুচির প্রেমালাপ,’ ‘ছেঁড়া চুল,’ ‘দড়ির হা ছতাশ’—এ সব কবিতা যদি শুন্‌তে, তাহ'লে বুঝতে, স্পর্শমণি সত্যই লোহাকে সোনা করে !”

আমি বলিলাম,—

“ভায়া, আমি না শুনেই বুঝছি, বিশেষতঃ ঐ ‘দড়ির হা ছতাশ’টা । সেটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার হ'য়েছিল, কেননা প্রেমে গলা বেষ্টন করতে না পেরে তার যে কি আক্ষেপ !—”

বন্ধু চটিয়া বলিলেন,—

“দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না !”

আমি বলিলাম,—

“না । সে কথা ঠিক !—এখন কি চাও, বল ।”

ব্যারিষ্টার উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

“চাই ! চাই ধন্য হতে, চাই মানব জীবন সার্থক করিতে, চাই সেই সিনিয়রের (Senior) মুণ্ডপাৎ করিতে, আর তার কণ্ঠকে আমার ব্রাহ্মণী করিতে ।”

“চাও তো, কিন্তু কেমন ক’রে হবে ?”

“সে তুমি বোঝো । খুব লম্বা কথা কইলে, কি চাও ? আমি তোমায় বল্‌লুম, যা চাই ।”

“আচ্ছা ভায়া, এ ষারিক্ চট্টরাজকে তুমি চেন ?”

“সে ব্যাটাকে চিনিনি ? সে আমাদের জ্ঞাতি । তার ঠাকুরদা এখানে এসে ব্যবসায় অনেক টাকা রোজকার করে । তাদের ধরেই আমার বাপ এখানে এসেছিলেন । ব্যাটা বদখৎ, বেয়াড়া বুনো ব্যার !—ধারে না লেখা পড়ার ধার ! ব্যাটা বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার ! আর আমার কপালে খার ! ভায়া, একে যদি করতে পার পগার পার, তাহলে আমাকেও বাঁচাও, চপলাকেও বাঁচাও । একেবারে এক টিলে দুই পক্ষী মরবে ।”

সত্য ! যা বলেন, এমন রোগ নেই যার ওষুধ নেই । দেখা যাক্ না কত দূর কি হয় ! বন্ধুকে বলিলাম,—

“ভায়া ঘাব্‌ড়োনা ।”

বন্ধু বলিল, “কেন ঘাব্‌ড়াবনা ! খুব করুব ঘাব্‌ড়াব । ঘাব্‌ড়ালে সে বুড়ো ব্যাটা কি করবে ?”

নকল পাঞ্জাবী

আমি বলিলাম,—

শোনো, আগে আমি একবার সহর জমিন তদন্ত ক'রে দেখি। যদি কিছু করতে পারি। না পারি তখন ঘাবড়ো।”

ব্যারিষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিল। সোৎসুক নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল,—

“Arm ! Arm ! it is—it is—the cannon's opening roar !—অস্ত্রধর, অস্ত্রধর, প্রেমের গর্জন ! এখানে cannon মানে কাগান নয়—প্রেম। যাও বীর, অক্ষয় যশ উপার্জন ক'রে এস। বিজয় লক্ষ্মীর জয়গাল্য মাথায় জড়িয়ে এস, আর মাঝে মাঝে আমার মিস্ চপলার খবরটা দিয়ে যেয়ো।”

আমি বিদায় হইলাম।

৪

খবর নিলুম, গাজুলী একজন লোক চায়, তার ফায় ফরমাস্ খাটবে। কিন্তু বোকা সোকা লোক হবে। উনি যা বলবেন, বাচ্ বিচার না ক'রে তাই করবে। তার ডান বাঁ জ্ঞান থাকবে না। দেখবে, তাঁর চোখে, শুনবে তাঁর কানে, আর ওগ্রাবে তাঁর কথা—হজম্ না করে। কোন চতুর লোক একবার কি তাঁর অনিষ্ট করেছিল, সেই থেকে হুঁসিয়ার হ'য়েছেন।

এই ত সুযোগ ! শত্রুর কেল্লায় প্রবেশ করতে হবে—
all is fair in love and war. “ব্যারিষ্টার বন্ধু হয়ত এর
অনুবাদ করত “প্রেমে কি আহবে হয় সকলই সুন্দর ।” একটা
মৎলব এঁটে মাঝে বল্লুম,—

“মা !”

“কি ?”

“আমাদের ব্যারিষ্টারের গতিক বড় ভাল নয় !”

মা আমার মূর্তিমতী জগদ্ধাত্রী। এমন হতভাগ্য কেহ
নাই, যার জন্ম তাঁর চক্ষে করুণার অশ্রুর উদয় হয় না। মুখে
দরদের ‘আহা !’ নির্গত হয় না। আমি এ ছোটখাট
মানুষটির হৃদয়ের অন্ত পেলুম না। এ হৃদয়ের করুণাধারা যে
দুঃস্বপ্নে পান করেছে, সে সত্যই ভাগ্যবান। আমার মা
আমার নরজন্মের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ব’লে মনে করি।
ব্যারিষ্টারের কথা শুনিয়াই মা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বলিয়া
উঠিলেন,—

“কেন রে, কেন রে !—কি হয়েছে !”

“সে পাগল হবার যোগাড় হয়েছে ।”

“কেন ! কেন ?”

“বের জন্মে !”

“ওমা ! তাই বল, তা বে করক না, বেশ তো।

নকল পাঞ্জাবী

তোমার মতন সকাই নাগা সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকবে নাকি ?
আপনি বে করবি না, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব—তাদেরও বে
করতে দিবিনি !”

“দেব না কেন, মা ? আমি যে তার ঘটকালি করতে
যাচ্ছি ।”

“হাঁরে খোকা ! এত লোকের বের ঘটকালি করে
বেড়াচ্ছিস, আমার একজনের বে দিয়ে দেনা ?”

“কেন দেবনা, মা !”

“দিবি, বল ?”

“হাঁ দেব—নিশ্চয় দেব । যদি ভাল পাত্তোর হয়, বের
ভাবনা কি ?—কার মা ?”

“এই তোমার কথাই বলছিলুম । দেখিস্ বাছা, আমার
কথা দিয়েছিস !”

আমার পাঠক পাঠিকাকে আমি একটি কথা বলিয়া রাখি,
মায়ের কথা মকে হ'লে আমার কথা ফুরোয় না । আমার এই
দুর্বলতাটুকু ক্ষমা করিতে হইবে । আমি মাকে বলিলাম,—

“মা, আমি তোমায় বলেছি, ভাল পাত্তোর হ'লে বে
দিয়ে দেব ! যাক্ সে কথা, এখন শোনো, ব্যারিষ্টার যে
মেয়েটিকে বে করতে চায়, তার বাপকে কোন রকমে রাজি
করতে হবে । লোকটা এক রকমের ! আমায় তার সঙ্গে সঙ্গে

দ্বিতীয় প্রস্তাব

থাকতে হবে। রাজি করবার জন্যে সময় মত কথা পাড়তে হবে। কিছু দিন যদি সময়মত আমি আসতে যেতে না পারি, তুমি ভেবো না। মনে করো না, তোমার খোকা কচি খোকা ; গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়েছে।”

মাকে সম্মত করিয়া আমি বাহির হইলাম, গরীব লোকের মত বেশ করিয়া। মার চরণ স্মরণ করিয়া মিঃ গ্যাঙ্গুলীর বাড়ী গিয়া উঠিলাম। গ্যাঙ্গুলীর বাংলোর সামনে ফুল বাগানে দুইখানি চৌকিতে পিতা ও দুহিতা বসিয়া আছেন। তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন। আমি সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। গ্যাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে তুমি ?”

“হজুর ! আপনি একজন লোক খুঁজতে ছিলেন—”

“ওঃ—তুমি সেই কাজ চাও ? পূর্বে কোথায় চাকরী করতে ?”

“হজুর ! চাকরী কোথাও করিনি।”

“ওঃ—চাকরী কোথাও করিনি ? তবে এখন কেন চাকরী করতে এসেছ ?”

“তাই তো হজুর ! কেন এসেছি, তা তো বলতে পারিনি। চাকরী করতে ইচ্ছা হয়েছে, সমস্ত দিন ব'সে ব'সে ভাল লাগে না।”

নকল পাঞ্জাবী

“হঁ—বল, থাম্লে কেন ?”

“আজ্ঞে, আর কি বলব ?”

চপলা এতক্ষণ গোলাপ কলি এবং ফার্ন লইয়া বাটন্ হোল্ (Button hole) তৈরি করিতেছিল। ব্লাক্ প্রিন্স্ (Black prince) গোলাপের কুঁড়ি মেইডেন্ হেয়ার্ (Maiden hair) ফার্ন অতি নিপুন হস্তে সোনালি সিল্কের সূতোয় বাঁধিতেছিল। খানিকটা সূতা বড় হইল। নিজে টানাটানি করিয়া ছিন্ন করিতে পারিল না। হঠাৎ আমার হাতে সেই তাড়াটি দিয়া বলিল,—

“এইটে ছিঁড়ে দাও দিকি ?”

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে লইয়া অল্পান বদনে ফুল ফার্ন টুকরো টুকরো করিয়া ছিড়িয়া তাঁহারই হাতে ফিরাইয়া দিতে ঘাইতেছি, তিনি একটা ‘উঃ’ বলিয়া হাত গুটাইয়া লইলেন এবং স্তম্ভিত বিস্মিত ভাবে বড় বড় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ গ্যাঙ্গুলী হো হো করিয়া হাসিয়া হাত তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, “ব্রাভো ! ব্রাভো !”

বুঝিলাম, আমার জয় হইয়াছে। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

“আজ থেকে—এই মুহূর্ত থেকে, আমি তোমায় কাজে নিযুক্ত করলুম।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

মিস্ চপলা পিতার কথা শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের পানে একবার চাহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

“কেমন, তুমি পারবে তো?”

“আজ্ঞে এই ফুলের তোড়া ছিঁড়তে, হজুর? তা পারবো বই কি।”

গ্যাঙ্গুলী এবারও উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

“না, শুধু তাই নয়। আরো দুই একটা কাজ আছে। যেমন যেমন ব’লে দেব তেমনি করতে পারবে তো?”

“আজ্ঞে, মনে হয় তো পারব।”

“কিন্তু এক সঠিক। এখানকার কথা কারো কাছে কোথাও গল্প করতে পারবে না। এই জগেই আমি পাঞ্জাবী লোক রাখছি, নইলে বাঙ্গালা থেকে বাঙ্গালী ঢের আনিয়ে নিতে পারতুম। বাঙ্গালীগুলো বড় ফালতো বকে।”

“আজ্ঞে, কোন্‌খানে কাজ করি, তাও কি বলতে পারব না?”

“না।”

“তবে কি বলব?”

গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

“আচ্ছা, সে আমি পরে ব’লে দেব, কি বলবে।”

নকল পাঞ্জাবী

“যে আজ্ঞে, হুজুর ! কিন্তু আমারও এক সৰ্ত্ত আছে । আমি বাড়ীতে গিয়ে খাব আর রাত্রে আপনার এখানে থাকুব না !”

মিঃ গ্যাঙ্গুলীর একটি স্বভাব ছিল, মনের মধ্যে যখন কোনো কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতেন, তাহা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে করিতেন । বোধ করি, কোটে বক্তৃতা করিয়া করিয়া তাহা এই স্বভাবে পরিণত হইয়াছে । নিজেকে নিজে বক্তৃতা করিয়া কথা বলেন । আমি আমার সৰ্ত্তের প্রস্তাব করিলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন অর্থাৎ বিড় বিড় করিতে লাগিলেন ।

“তাই তো, লোকটা বোকার যাস্থ । হা—হা—কি মজা ! স্মৃতোটা ছিঁড়তে বললে, তোড়াটা অনায়াসে সে কুচি কুচি ক’রে ফেললে ! এমন মনের মতন লোক শীগ্গীর পাবনা । এই তো এদিন খুঁজছি ।—ওহে ! তুমি রাত্তিরে থাকবে না বলছ, সন্ধ্যার পর যদি কোনো কাজ পড়ে ?”

“আজ্ঞে, কাজ করে দিয়ে যাব কিন্তু থাকতে পারুব না ।”

“বেশ তাই । কি হ’লে তোমার চলে ?”

“আজ্ঞো, তা তো বলতে পারিনে ! সে আমার মা জানে ।—তা কি দিতে পারেন ? যা দেবেন তাই, আমার খালি এক মা ।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“আচ্ছা বেশ, তোমার কাজ দেখে যদি সন্তুষ্ট হই, বেশ ক’রে খুসী ক’রে দেব।”

চাকরী স্থির করিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

৫

পরদিন মিঃ গ্যাঙ্গুলী আমাকে চাকরীতে রীতিমত বদলা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলাম।

মিস্ চপলা সহসা তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাকে দেখিয়াই আবার ঢুকিয়া পড়িলেন। তার পর আবার একবার দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমি বুঝিলাম, ইনি আমাকে এক অদ্ভুত জানোয়ার ঠাওরাইয়া বসিয়াছেন, তাই নিকটে আসিতে ভয় পাইতেছেন। এমনি দুই তিনবার কক্ষ মধ্য হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিতেই আমি একটি সসম্মম সেলাম দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তুমি আর কোথাও চাকরী করনি?”

আমি বলিলাম,—

“হজুর, চাকরী বাকরী আর কোথাও করি নি। তবে

নকল পাঞ্জাবী

একজন ব্যারিষ্টার বাবু আমায় বড় ভালবাসেন, তাঁর কখনো কখনো ফায়টা ফরমাসটা খাট্‌তুম।”

মিস্ চপলা গালে হাত দিয়া বলিলেন,—

“ও মা! এমন লোকও আছে, তোমায় দিয়ে ফায় ফরমান খাটায়।”

“আজ্ঞে, সকল কুকুরেরই মূগুর আছে!” উত্তরটাতে মিস্ চপলা বোধ হয়, একটু খুসী হইলেন। বলিলেন,—

“বল তো, বল তো, সে ব্যারিষ্টার কে? তাঁর নাম জেনে রাখা দরকার। তোমার মতন লোককে দিয়ে যিনি কাজ আদায় ক’রে নিতে পারেন, তিনি হয় তোমারই মতন, নয় খুব বুদ্ধিমান।—কে ব্যারিষ্টার?”

“আজ্ঞে, তাঁর নাম চট্টরাজ সাহেব। কিন্তু লাহোরে তাঁকে অনেক লোকে নামটা সোজা ক’রে ‘চটি’ সাহেব ব’লে ডাকে।”

চট্টরাজ সাহেবের নাম করিতেই মিস্ চপলার মুখখানি লাল টক্টকে হইয়া উঠিল। তার পর ‘চটি সাহেব’ শুনিয়া তাঁর হাসি আর থামায় কে? অবশেষে সংঘত হইয়া কিছু দূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

“আচ্ছা, তুমি চটি সাহেবের কি কাজ কর্তে? তাঁর জিনিষ পত্র আসবাব বোধ হয় ভেঙ্গে চূরে তচ্‌নচ্‌ করতে?”

“আজ্ঞে, সব নয়। আর সব কথাও আমার মনে নেই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তবে, এই গেল মাসে চার খানা চেয়ার, ছটা গ্লাস, চারটা ল্যাম্প—এই তচ্ নচ্ করেছি।”

“তঁাকে আস্ত রেখে এসেছ তো?”

“আজ্ঞে হাঁ।—না—না—হুজুর, ঠিক আস্ত নয়, তিনি বড় অসুস্থ।”

“অসুস্থ! কেন, কেন, কি সে?—জ্বর হয়েছে না অন্য কিছু অসুখ?”

“আজ্ঞে তা বলতে পারিনি, হুজুর! তবে দেখি, তিনি খালি কবিতা লিখছেন।”

“তবে তো ভারি অসুখ! আচ্ছা, তুমি তঁাকে ছাড়লে কেন?”

“আমি ছাড়ব কেন, হুজুর? তিনি আমাকে ছাড়লেন।”

“কেন? তিনি তোমাকে ছাড়লেন কেন?”

“আজ্ঞে, তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর বসে খাচ্ছেন, আমি সেই খানে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ তিনি চোঁচিয়ে ব’লে উঠলেন—মারো, মারো।—আমি আর দ্বিধা না করে তাকে ঘা কতক দিয়ে দিলুম। তিনি রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—ফুল! আগাকে মারুছিস্ কেন?—মারুলি যে?—আমি তাকে, আমাকে মারতে বলেছি? রোজ ঐ বেরালটা দুধ খেয়ে যায় দেখিস্ নি?”

নকল পাঞ্জাবী

মিস্ চপলা মুখে রুমাল গুঁজিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইয়া একেবারে ফাটিয়া পড়িবার যোগাড় ! আমি বলিলাম ।—

“বলুন তো, হুজুর ! আমি ফুল হলাম কিসে ?”

“কেন ? ফুল তো ভাল । তোমায় ফুল বলেছেন ।”

“হুজুর ! আমাকে ও ব'লে ঠাণ্ডা করলে চলবে না । সাহেবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে লিখতে পড়তে না জানি, ইংরেজি কথা দু'টো চারটে শিখেছি । ফুল মানে আহাম্মক হুজুর !”

“তারপর মার খেয়ে তোমার চটি সাহেব কি করলেন ?”

“আজ্ঞে, এক পেয়ালা গরম দুধ খাচ্ছিলেন, সেইটে আমার গায় ঢেলে দিলেন ।”

“তুমি কি করলে ?”

“আমি বললাম,—হুজুর । দুধটা গায় ঢেলে দিলেন কেন ? আমার গালে ঢেলে দিলেই তো পারতেন ।”

“ঠিক তো । এখন বোঝ, তুমি ফুল না তোমার চটি সাহেব ফুল । হাঁ—তারপর কি হ'লো ?”

“চটি সাহেব বললেন, তুই আর এখানে থাকিসনে ।”

মিস্ চপলা বলিলেন,—

“তা হবেনা ।—হাঁ—তোমার নাম কি ?”

“আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই—”

“মনে পড়ছে না নাকি ?”

“আজ্ঞে হাঁ, মনে পড়ছে, একটু একটু—”

“একটু একটু কি ? পুরো নামটা মনে নাই ?”

“আজ্ঞে, আছে বই কি হুজুর ! কিন্তু হুজুর যে তাড়া
কচ্ছেন !”

“আচ্ছা, তোমার মনে করতে হবে না । আমি তোমায়
‘দাদাভাই’ ব’লে ডাকব । দেখ দাদাভাই, সেই চটি সাহেবের
কাছে তোমায় যেতে হবে । তিনি তোমায় দেখে কি বলেন,
কি করেন, এসে আমায় বলতে হবে ।”

“আমি তাঁকে গিয়ে বলব, আপনি পাঠিয়েছেন ?”

মিস্ চপলার মুখ আবার রাঙ্গা টুকটুকে হইয়া উঠিল ।
কিন্তু রাগে নয় । তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

“কথখনো না—খবরদার না—আমার নাম ক’রো না ।”

“তবে তাঁকে কি বলব ?”

“বলবে আবার কি ! এই যেন তাঁর অসুখ, আর তুমি
তাঁকে দেখতে গেছ । কিন্তু আমাকে এসে বলতে হবে,
তিনি কেমন আছেন, কি কচ্ছেন, কি বললেন ।”

আমি ইহাই চাহিতেছিলাম । আদরের ‘দাদাভাই’
সম্ভাষণ ইহারই ভণ্ড । এ রমণী সত্যই আমার বন্ধুবরকে
ভালবাসে । তাহার ভণ্ড ইহার প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিতোছে ।

নকল পাঞ্জাবী

তাই সে কেমন আছে বা কেমন থাকে, খবর লইবার জন্ম এত
ছল—এত কৌশল করিতেছে।

শক্তি মূর্তি স্থাপনা করিতে গেলে ভৈরব চাই, আর শিব
স্থাপনা করিতে গৌরিপটু আবশ্যিক। আমি এই ভৈরব
ভৈরবীকে স্থাপনা করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিব। বেলা-
মোহিতের ঘটকালিতে আমার পসার খুব বাড়িয়া গিয়াছে।
অকস্মাৎ লোক, চাই কি এ ব্যবসায়টা করিয়াও দিন গুজরাণ
হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকপাঠিকার কাছে এই সুযোগে
ঘটকালির আর্জিটা পেশ করিয়া রাখিলাম।

এখন দ্বারিক চট্টরাজকে স্বচক্ষে একবার দেখিতে হইবে।
দক্ষ সেনাপতি যুদ্ধের পূর্বে দেশ কাল পাত্র স্বয়ং পর্যবেক্ষণ
করিয়া কার্য করেন। আমি দ্বারিকের সহিত পরিচয় করিবার
জন্ম প্রস্তুত হইলাম। দ্বারিকের বাড়ী লাহোর সহরে নয়,—
সহরতলীতে। এদিকে আমার আনা গোনা কালে ~~ভাড়া~~
লাহোরে আমার পুরুষানুক্রমে বাস, কিন্তু আমি কিছুই চিনি।
চিনি কেবল মাকে আর আমার ক্লাবের বন্ধুদের। আর
সম্প্রতি কিছুদিন আগে একটি রত্ন চিনিয়াছি—আমার সেই
ঠাকুরদাকে।

যাহা হউক খুঁজিয়া বাড়ী ঠিক করিলাম এবং সেই দিনই
সন্ধ্যার পর কপাল ঠুকিয়া দ্বারিকের বৈঠকখানায় উপস্থিত

দ্বিতীয় প্রস্তাব

‘হইলাম। চট্টরাজ তখন ‘সুধা পানে ঢল ঢল।’ আমাকে দেখিয়াই সে বলিল,—

“কে বাবা! যমদূতের মতো এসে দাঁড়ালে? এখন স’রে পড়, আমরা একটু ফুর্তি করছি। খোঁয়াড়ির সময় এসো।”

শৃগালের ঐক্যতান বাদনের ন্যায় চট্টরাজের পাঞ্জাবী ইয়ারবর্গ ছয়া ছয়া করিয়া রকম রকম সুরে হাসিল। আমি বলিলাম,—

“আমি ঘটকালি ক’রে থাকি।”

বাবু বলিলেন,—

“বলছি এখানে কিছু হবে না। স’রে পড় না বাবা!”

“হজুর। আমি ভিক্ষে করতে আসিনি, ঘটকালি করতে এসেছি।”

“ও-ও-ও—ঘট-ঘট-ঘটকালি! জয় মা, ঘটকালি! জয় ~~ঘটকালী~~ ঘটকালী! জয় মা, রক্ষাকালী!”

বলিয়া মাতাল আমার মাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—

“মা ঘটকালি, আমার বে হ’য়ে গিয়েছে! কেবল মা বেটা বজ্জাতি ক’রে বৌ ঘরে আনছে না। তুমি যদি আমার বৌ এনে দিতে পার, আমি শনিবার অমাবস্যের ভৈরবী চক্রর ক’রে (হাতে সাপের ফণা দেখাইয়া) তোমায় পেট ভরে মদ পাঁটা দিয়ে পূজো দেব।”

নকল পাঞ্জাবী

আমি বলিলাম,—

“তথাস্তু ! কাল দুপুর বেলা আমি আসব ?”

মাতাল বলিল,—

“একেবারে বৌ সঙ্গে নিয়ে ।”

“তথাস্তু !”

বাবু উঠিয়াই নাচিতে আরম্ভ করিলেন,—

“উর-র-র বৌ আসবে ঘটকালী ! উর-র-র বৌ
আসবে পটকালী !

সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার বর্গও নাচিতে লাগিল । আমি সেই
অবসরে প্রস্থান নয়—পলায়ন করিলাম । সর্বনাশ ! এই
বেলেলা বেঙ্গিকের হাতে চপলা ! ভৈরব ভৈরবীর চক্র !
মা ঘটকালী, তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার কাছে ছোড়া
নয়-নারী বলি দেব ।

৬

পরদিন বাড়ীতে খাইতে আসিবার ছুটি পাইলে আমি
দ্বারিকের নিকট গেলাম । তখন তাহার অবস্থা গতকল্যকার
চেয়ে কিছু ভাল, কিন্তু মুখে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে !
আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—

“কে তুমি ?”

আমি উত্তর দিলাম,—

“আমি কাল আসিয়াছিলাম, ঘটকালি করিতে ।”

বাবু বলিলেন,—

“ঘটকালির মতো ঘটকালি করতে পার তো বে করতেও রাজি, বখশিস্ দিতেও রাজি ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কি রকম ঘটকালি আপনি চান ?”

“রকম সকম আমি বুঝি না। আমি চাই চপলা গাঙ্গুলীকে বে করতে ।”

আমি মনে মনে বলিলাম—“আর সে চায় তোমার মুখে ঝাড়ু মারতে ।”

আমার মনে হইল, এই ম'দো মাতালের মুখে চপলার নাম উচ্চারিত হইয়া কলঙ্কিত, অপবিত্র হইয়াছে ।

বাবু বলিলেন,—

“কি, একেবারে চক্ষুস্থির ! ব'লেছি তো তোমার কৰ্ম নয় !”

“আমার কৰ্ম নয় তো কার কৰ্ম ? মিঃ গ্যাঙ্গুলী তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের সমস্ত ভার আমার উপর দিয়েছেন।—আমার কৰ্ম নয় ! কি, আমি না সম্বন্ধ করলে, সে মেয়ের কে বে দেয়. দেখ্‌বো !—হঁঃ, আমার কৰ্ম নয় !—বেশ, আমি চল্লুম !”

নকল পাঞ্জাবী

আমি চলিয়া আসিবার ভান করায় চট্টরাজ বলিল,—

“চট্টো কেন ?—আ-হা-হা—শেনোই না। বলি—”

“আর বলাবলি কি মশায় ? আমি কথা না পাড়তেই, আপনি ব’লে বসলেন—তোমার কৰ্ম নয়। নয় তো নয় !”

“আচ্ছা, বাবা ঘাট হয়েছে। বলছি—তোমার কৰ্ম—তোমার কৰ্ম—এই তিন সত্যি করলুম !”

মাতাল ক্রমেই পাকিয়া, উঠিতেছে। আমি দেখিলাম, কাজ বাগাইবার এই সময়। বলিলাম,—

“আমাদের চটাচটি কি বাবু,—গরীব লোক, একটা সম্বন্ধ পাকাপাকি করতে পারলেই দু’পয়সা পাব।”

বাবু বলিলেন,—

“দু’পয়সা কি ! আমি তোমাকে দুশ মোহর দেব। কিন্তু বাবা, এক যায়গায় বাধছে।”

“কি, গিন্নী মা ঘরজামাই হ’তে দিতে রাজি হচ্ছেন না ?”

“ই-য়া, ই-য়া, ই-য়া ! তুমি ঠিক বুঝেছ। সব জানো দেখছি ! বল তো, বাবা ঘটকালি ! তোমার গিন্নীমাকে নিয়ে এখন কি কি করা যায় ?”

“আস্তে হজুর, সে ভার আমার। গিন্নীমাকে বুঝিয়ে রাজি করবার ভার আমার।”

“কে বাবা তুমি স্বচর্চীর হাঁস ! বাবা হংস, আমাকে

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বর দাও, যেন ড্যাং ড্যাং ক'রে গিয়ে চপলা গাঙ্গুলীর বর হ'য়ে
বাসরে ব'সতে পারি।”

এই সময় কাজ আদায় না করিলে বেটা ক্রমেই ভীষণ
হইয়া উঠিবে। বলিলাম,—

“বাবু, সন্ধ্যার পর চালাবেন এখন। এখন কাজটা
পাকাপাকি হোক।”

“একটু পেকে পাকাপাকি করলে হবে না?”

আমি হাত যোড় করিয়া বলিলাম,—

“মাপ করবেন! সে ব্যারিষ্টার, তাঁর কাছে কাঁচা চাল
চলবে না।”

মাতাল বলিল,—

“তাই তো বুঝিতে পাক ধরাচ্ছিলুম! আচ্ছা, তুমি
বললে,—এই গেলাস নাবিয়ে রাখলুম। কি করতে হবে,
বল বাবা মঙ্গলচণ্ডী! এই গেলাসের চার পাশে গণ্ডী দিলুম।
এখন আর ছোঁব না—খাব না। খাই যদি তো গোরক্ক,
ব্রহ্ম-রক্ক!”

বলিয়াই ছোঁ মারিয়া গেলাস তুলিয়া লইয়া চোঁচা পান
করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম,—

“দোহাই বাবু, একটু থামুন।”

নকল পাঞ্জাবী

“থেমেছি তো। দিব্যি ক’রেছি, তোমার কথা দিয়েছি, আর খাই? কি বল? মা বেটীকে রাজি করতে পারবে?”

“হুজুর, গিন্নীমাকে পরে এক সময় রাজি করলেই হবে। আপনি আগে তো বিয়ে ক’রে ফেলুন।”

“ঠিক বলেছ! তোমার বড় ভবর মংলব! এক গেলাস খাও, আরো মাথা খুলবে।

“হুজুর, আমার মাথার চারদিক খোলা। দরজা, জান্না, খড়খড়ি সানি—সব একেবারে হাট! আর খুললে, যে টুকু বুদ্ধি আছে, সব উড়ে যাবে।”

“বন্ধ করে দাও—বন্ধ ক’রে দাও! খবরদার বলছি, বুদ্ধি যেন উড়তে দিয়ো না। কি বল, আগে বিয়েটা ক’রে ফেলা যাক। তারপর সময় মত গায় হলুদ হবে।—কেমন?—তুমি আচ্ছা মংলববাজ!

“হাঁ হুজুর! কিন্তু একটা যে বড় গোল বেধে আছে?”

“আবার কি গোল! আরে ছ্যাঃ,—কোথায় আকাশ-পিদ্দিম আর কোথায় গঙ্গা-কড়িঃ—একেবারে ঘাসের ওপর চিৎপাং! তোমার কি একটু দয়ামায়া নেই? কি দাগাটা দিলে বল দিকি!”

“আজ্ঞে বাবু, দাগা কি? কিসে দাগা? আপনি তো আপনার বিষয় সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব লিখে দিতে রাজি?”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“কাকে ? তোমাকে ? অস্তুরা ভাঙ্গ না, বাবা !”

“আমায় কেন, হুজুর ?—চপলা গাঙ্গুলীকে ।”

“আলবৎ ! শুধু বিষয় সম্পত্তি কি, চপলা গাঙ্গুলীকে আমি দাসখৎ লিখে দেব, তার বুড়ো বাপকেও দেব, তোমাকেও দেব । তুমি আমার বৌ এনে দাও । চপলাকে দিও আর কিছু মদের খরচ দিও, বেশী নয় বাবা, রোজ চার বোতলের দাম দিও ।”

“সে সব ঠিক হবে । আপনি ঠিকানা লিখে দিন না !”

“বেশ কাগজ কলম নিয়ে এস ! দাওয়ানখানায় যাও ।”

আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া দোয়াতকলম, কাগজ, খাম আনিলাম । বাবু বলিলেন,—

“লেখো ।”

আমি বলিলাম,—

“হুজুর, এ প্রণয়পত্র, আপনি নিজে হাতে লিখুন ।”

হুজুর বলিলেন,—

“আমি কোনো কালে লিখিনি, খালি সই করি । জানো চাঁদ ঘটকালি,—বড় গান্ধী কেতা শেখ । সরকার লেখে, বড় লোক সই করে । সেই মক্‌সো করতে তিন রিযু কাগজ গেছে ! লেখ বাবা লেখ, আমি সই ক’রে দেব । লেখ—
‘মেরি পিয়ারী, আমি তোমার নয়ন-কুঞ্জের দোয়ারী ।—’”

নকল পাঞ্জাবী

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আফ্লাদে আটখানা। নাচিল না, কেননা এখনও তত নেশা হয় নাই। বলিতে লাগিল,—

“হায়, হায় ! কেয়া কহে না !—দোহা বন্ গিয়া, ভেইয়া !
মেরী পিয়ারী, আমি তোমার চরণ-কুঞ্জের দোয়ারী।—দোয়ারী
—যেমন রাধা র কুঞ্জে পাহারা—চুড়ো বাঁধা দোয়ারী—দরো-
য়ান। আবার এদিকে দোয়ারী কিনা—আমি ঘারিক^২প্রসাদ
চট্টরাজ।—সাবাস !—সাবাস !—কেয়া দেলখোস ! কি বল,
বাবা ঘটকালী, কেমন ? কবি কিনা, বল ? ছটো, বাহাবা
দাও, বাবা—নইলে ছাতি হবে কেন ?—ছাতি বাড়াও !
বাবা ঘটকালী, দেখো বাবা, যেন শেষ বলতে না হয়—বেটা
ঘটকালি ! বাহাবা ! আজ কেয়া বখ্ত ! আমার নাচতে
ইচ্ছে কচ্ছে ।”

আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি বলিলাম,—

“বাবু চিঠিখানা শেষ ক’রে ফেলুন, তারপর নাচবেন ।”

“আচ্ছা, বাবা ঘটকালী কুছ্ ডব্ব নেহি—আমার নেশা—
হয়নি—কি বল ?—হাঁ—কতদূর হয়েছে ?”

যতদূর হইয়াছে, আমি পড়িলাম। মাতাল বলিল,—

“হাঁ, মেরী পিয়ারী, আমি তোমার দশন-কুঞ্জের দোয়ারী !
তুমি আমার খোয়ারী ! ঘটকালী বাপ, আমার বুক ফেটে
যাচ্ছে—আমার হাট ফেল্ হচ্ছে ! ওঃ, আমি এমন বাহাদূর

তা জানতুম্ না ! আমি আর বাঁচব না !” বলিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

আমি বলিলাম,—

“খুব বাঁচবেন খুব বাঁচবেন ! নিদেন চিঠিখানা লিখে মরুন !”

“আবার কি লিখব ? লেখার চূড়ান্ত করেছি ! তোমার বাংলা দেশ, যেখানে কবির আড়ং—সেখানে কোন্ ব্যাটা কবি আছে, আমার মতন লিখতে পারে-? আমি আর বাঁচব না ! বাবা ঘটুকালী, আমি আর বাঁচব না !”

আবার বিকট স্বরে ক্রন্দন । আমি বলিলাম,—

“বালাই, বালাই ! ষাট ষাট আমার ষষ্ঠীর দাস, ষেটের বাছা !”

“বাঁচবো ? ঠিক বাঁচবো ? একটুও মরুব না ?”

বলিয়াই মাতাল ভুমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল ।

আমি বলিলাম,—

“ও চিঠি তো লিখলেন চপলা গাঙ্গুলীকে । এখন তার বাপকে তো একখানা লিখতে হবে !”

মাতাল বলিল,—

“আমার দায় পড়েছে ! সে ব্যাটা আমার কে যে তাকে চিঠি লিখব ?”

“হুজুর, তাঁকে না লিখলে, তিনি বৌ পাঠাবেন কেন ?”

“বটে, বটে ! ব্যাটা এত বড় পাজি ! না লিখলে বৌ

নকল পাঞ্জাবী

পাঠাবে না ? ব্যাটার কি দারুণ জেদ রে বাপ ! ব্যাটা কৌশলি কি না । জেরায় জঙ্গ করবে ? তা হচ্ছে না বাবা ! আমিও ছাড়ব না ।”

“তাই তো বলছি হুজুর ! মিষ্টার গাঙ্গুলিকে একখানা চিঠি লিখে দিন ।”

“আমার ব’য়ে গেছে ! দরকার হয়, তুমি লেখ ।”

“আপনি সহই ক’রে দেবেন, কেমন ?”

“একটা সহই কেন বাবা, আষ্টে পিষ্টে সহই করব । জান না, তিন রিম কাগজ মকুস ক’রে সহই করা শিখেছি ! লিখে ফেল না বাবা ? যা লিখবে, ঝট পট্, লিখে চট্ পট্ বো এনে দাও । আমি স্মান ক’রে, খেয়ে একটু ঘুমুই । নইলে বাসর জাগব কেমন ক’রে ?”

“তবে পিয়ারীর চিঠিখানা সহই করুন ।”

বলিয়া আমি দ্বারিক চটুরাজের হাতে কলম দিলাম । আমার দেখার উদ্দেশ্য, সহটা ঠিক করিতে পারে কি না । দস্তখৎ ক’রে ক’রে এদের এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই বেঠিক সহই করে না । দস্তখৎ ঠিক ঠিকই করিল । সে চিঠিখানা লইয়া আমি বলিলাম,—

“তবে মিষ্টার গাঙ্গুলীর চিঠিখানি আমি লিখি, আপনি সহই ক’রে দেবেন । তাতে কিন্তু ইংরেজি দস্তখৎ করিতে হবে ।”

হুজুর বলিলেন,—

“আলবৎ! ইংরিজি সহ আমি পারি নি? আচ্ছা বাবা, তুমি লেখ। আমি এমন সহ ক’রে দেব, কোন শালা বুঝতেও পারবে না, পড়তেও পারবে না যে—ডি, পি, চট্টরাজ! কেবল ইকুড়ি মিকুড়ি চাম্‌চিকুড়ি—চামে কাটা চট্টরাজ! বাংলা দেশে এমনি একটা খেলা আছে না? হ্যাঁ বাবা! মিছে কথা ব’লো না, নরকে যাবে। ইংরিজি সহ কেবল ইকুড়ি মিকুড়ি। আমি কি জানিনি? বোকা পেলে? ব্যাটারা ইচ্ছে ক’রে সহ করে, কেউ নাম না পড়তে পারে। হ্যাঁ—হ্যাঁ বাবা ঘটকালী। বোকা পেলে? দস্তখৎ করব ঠিক হাঁসের ডিম আর কাঁকড়া! লেখ বাবা। দেরী করুছ কেন? আমার মাথা খাও, লেখ। আমার দিব্যি লেখ, তোমার পায়ে পড়ি লেখ।”

‘All is fair in love and war’—এই মহামন্ত্র জপিতে জপিতে আমি লিখলাম—

“My dear Sir,

আমি আপনার কন্ঠার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। যদি আপনার মত হয়, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার কন্ঠার নামে লিখিয়া দিব। আর আপনার বাটীতে পুত্রের গায় যাবজ্জীবন বাস করিব।”

নকল পাঞ্জাবী

চিঠি সহই হইল। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসি-
বার সময় চট্টরাজ বলিতে লাগিল,—

“দেখ বাবা ঘটকালী, বৌ নিয়ে সট্ কালি না হয়।”

আমি বলিলাম,—

‘না। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি আপনি এসে, আপ-
নাকে ডেকে নিয়ে যাব।’

“কেন, কেন?”

“বৌ আন্বার জন্ম।”

বলিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিলাম। পাছে আবার নৃত্য
আরম্ভ করে! কি পাপ!

৭

আমি আহারাশ্বে অপরাহ্নে মিষ্টার গান্জুলীর বাংলায়
গিয়া তাঁহার টেবিলের ওপর চিঠিখানি রাখিলাম।

এমন সময় মিস্ চপলা ডাকিলেন,—

“দাদা ভাই!”

আমি কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“দাদা ভাই, তোমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূর!”

আমি উত্তর দিলাম,—

“হাঁ মিসি বাবা।”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“ওমা ! মিসি বাবা কি ! আমার ভাই নেই, তোমাকে তাই দাদা ভাই বলি । তুমি আমায় দিদি বলবে ।”

“তবে ছজুরকে কি ছজুরদিদি বলবে ?”

“হা—হা—হা, হা—হা—হা—হা !”

কি মধুর ! আমার মনে হইল, সেই বড় টেবিল হার-মনিয়মটা যেন সপ্ত সুরে বাজিয়া উঠিল ! কি মধুর ! কি সুন্দর ! এঁরা কে ? সত্যই এঁরা কুহকিনী, মায়াবিনী ! সত্যই এঁরা মানবের গ্রীষ্মের বীজন, শীতের আবরণ, বর্ষার আচ্ছাদন, বসন্তের বিলাস ! সত্যই এঁরা অবসাদের উত্তেজনা, শ্রমের আরাম, ক্ষতের প্রলেপ, দেহের অর্দ্ধাঙ্গিনী, গৃহের লক্ষ্মী, জীবনের আশ্রয়, সংসারের সার ! এঁরাই সৃষ্টির চরম গৌরব ! ব্রহ্মার মানস ছবি ! বিচিত্র কি, এঁদের তুষ্টির জন্য নর সৃষ্টিচিন্তে শ্রম করে ! এক তিল হাসি দেখিলে সকল শ্রম সফল হয় ! এঁদের এক বিন্দু অশ্রু হরণ করিবার জন্য অকাতরে প্রাণ দেয় ! এঁদের রক্ষণের জন্য দুষ্কর সমরে শত্রুর গোলায় মুখে আত্মসমর্পণ করে । চপলার হাসির রেশ তখনও আমার কাণে বাজিতেছে । সে বলিল,—

“আমি তোমায় দাদা ভাই বলি, তুমি আমায় বলবে চপলা দিদি, কেমন ?”

“আচ্ছা ।”

নকল পাঞ্জাবী

“দাদা ভাই, তোমার মা কেমন ?”

“মা ? মা-ই আমার সব ।”

ইঠাং দিদির মুখখানি গলিন হইল । চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল । কপোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ।

একটা রূপকথা শুনিয়াছিলাম, হাসিলে মাণিক, কাঁদিলে মুক্তা বারে । আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম । একটি মৃত শ্বাস ত্যাগ করিয়া চপলা বলিল,—

“আমার মা নাই !”

মা নাই ! আরে অভাগিনী, তোমায় নিয়ে গিয়ে আমার মায়ের কোণে বনাতে পারতুম ! বুঝতে, মা কেমন ! মা নাই ! তুমি সতাই হতভাগিনী ! তোমার হৃদয়ের নীরব বেদনা বুঝবে কে ? অসুখ্যামী ? তিনি কি বোঝেন ? কই, বুঝতে তো পারি না ! তিনি যদি বোঝেন, তবে এ ধরায় এত হাহাকার কেন ? ঐ যে, তপ্তশ্বাস ঝঞ্জা বিতাড়িত ক্ষুব্ধ অশ্রু-সিক্কুর শুক্ক কল্লোল ! মা নাই ! মা নাই ! যখনই শুনি কেহ বলে—আমার মা নাই ! আমার তখনই মনে হয়, এ হতভাগ্যের চক্ষে এই সোণার সংসার অন্ধকার ! ইহার পক্ষে এই শ্রামলা, কুসুমকুণ্ডলা মেদিনী মরুভূমি ! এ অভাগা স্নেহের কোন্ অকালে অনাবৃষ্টির দেশ হইতে আসিতেছে ! ইহার অন্তরের

বুভুক্ষা অনিবার্য, তৃষ্ণা ছরপনেয় ; ইহার হৃদয় শুষ্ক, জীবন দুর্ভহ, সংসার বিষাদ !—ইহার মা নাই !

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া চপলা বলিল,—

“দাদা ভাই, তুমি চটিসাহেবকে দেখতে গিয়েছিলে ?

এ কক্ষে বিষাদের ভার গলিয়া আসিতেছে—ইহা দূর করিতে হইবে ।

আমি বলিলাম,—

“হাঁ, হজুর চপলা দিদি !”

তখন মুক্তার প্রশ্রবণ বন্ধ হইয়া মানিক ঝরিল—হা—হা—হা !

“হা—হা—হা—আবার বলে হজুর ! শুধু চপলা দিদি ।
—সাহেব কি কচ্ছিলেন ?”

“দীর্ঘনিঃশেষ ফেলছিলেন, শুধু চপলা দিদি ।”

আবার অজস্র গাণিকবর্ষণ ! সন্ধে সন্ধে সুধাস্বর—

“দেখ, তুমি ভারী বোকা ! আমার ভারী দুঃখ হয় ।
মনে হয় তোমার মা না থাকলে, কি হতো ? তুমি কিছু জান
না । শুধু চপলা দিদি কেন ?—চপলা দিদি । শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলছিলেন, আর কিছু না ?”

‘ আর চোখ ছল ছল কচ্ছিলেন ।’

“বটে, বটে ! ঝড়-বাদল দুই-ই !—লক্ষণ তো বড় মন্দ !
তারপর আর কি করলেন ?”

নকল পাঞ্জাবী

“আর বলছিলেন—

হৃদয় মাঝারে নিরাশ আঁধারে

চমকে চপলা ভাতি !”

কি ডাইনি গো ! সে মিন্লে মরুতে বসেছে আর এ
পোড়ারমুখী কি না রসিকতা আরম্ভ করে দিলে ! ওগো
ঠাক্করণ, আমায় যত বোকা ঠাওরিয়েছ, আমি তত বোকা নই,
আমিও কিছু কিছু বুঝি । সন্ধ্যার মেঘ চিরে যেমন গোখুলির
আলো বেরায়, তোমার এ রসিকতাও তেমনি !—যেন
দারিদ্র্যের দৈতো হাসি । চপলা বলিল,—

“দূর ! তুমি কি শুন্তে কি শুনেছ, দাদা ভাই ! চমকে
চপলা ভাতি—নয়, কখনই নয় । ‘চপলা ভাতি’ নয়, বোধ হয়
চড়ুইভাতির কথা বলছিল ।—Picnic party !”

আমি মনে মনে বলিলাম—ঠিকতো । যেখানে horse
অর্থে চপলা গাঙ্গুলী হয়, সেখানে চপলাভাতির পরিবর্তে চড়ুই
ভাতি না হবে কেন ? চড়ুই বলিল,—

“কেমন, নয় ? তুমি ভুলে গিয়েছ !”

আমি বলিলাম,—

“আজ্ঞে হাঁ, ঠিক । তিনি, ঐ দুটোই বলছিলেন ।
বলছিলেন—‘চপলা চড়ুই ভাতি ।’

“ওমা ! সে আবার কি ! তারপর কি বললেন ?”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“তারপর হঠাৎ চোখ চেয়ে আশায় দেখতে পেয়ে বললেন,
—তুই ব্যাটা আবার আশায় ঠাঙ্গাতে এয়েছিস্? পালা
শালা।”

চপলার হাসিটি বড় মিষ্টি! আমি বিভোর হইয়া
গুনিতেছিলাম। সেই সময় মিঃ গ্যাঙ্গুলী কোর্ট হইতে আসিয়া
আশায় ডাকিলেন। আমি সেলাম দিয়া দাঁড়াইলে টেবিলের
উপর ষ্টারিক প্রসাদের চিঠি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“এ চিঠি কখন এলো?”

আমি বলিলাম,—

“হুজুর, খানিক আগে।”

তারপর কি ভাবিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন, আমি তাঁহার
পশ্চাৎগে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি লিখিতেছেন—

My Dear Chattaraj,

আগামী কল্য সন্ধ্যার পর তুমি আমার সহিত সাক্ষ্য
ভোজ করিবে।

চিঠিখানি খামে পুরিয়া উপরে ঠিকানা লিখিলেন,—

D. P. Chattaraj, Esquire.

আশায় বলিলেন,—

“তুমি ডি. পি. চট্টরাজকে জান?”

আমি বলিলাম,—

নকল পাঞ্জাবী

“জানি, হজুর ।”

“তুমি সন্ধ্যার পর এই চিঠি তাঁকে দিয়ে বাড়ী চলে যেও ।”

“যে আজ্ঞে, হজুর ।”

সন্ধ্যার পর মিষ্টার গাঙ্গুলী নিত্য নিয়মিতরূপে বাংলোর সামনের বাগানে বসিয়া চপলাকে বলিলেন,—

“মামি ! (Mummy. গাঙ্গুলী প্রায়ই এই নামে চপলাকে সম্বোধন করিতেন) কাল সন্ধ্যার পর একটি বিশিষ্ট ভদ্র যুবক (যুবক কথাটার উপর জোর দিয়া) এখানে খেতে আসবেন ; দেখো, যেন অতিথি সংকারের কোন ক্রটি না হয় ।”

চপলা বলিলেন,—

“কাল বাবা ? কাল কেমন করে হবে ?”

“কেন ? কি হয়েছে ?”

“না, কিছু হয় নি ।”

“তবে ?”

“কাল আমার মাথা ধরবে ।”

গাঙ্গুলী হো—হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “পাগলী ! পাগলামো করিস্ নি, তুই কি চিরকাল এই বুড়ো ছেলে নিয়ে আইবুড়ো দিন কাটাবি ?”

“কেন বাবা, আমরা মায়ে ছেলেয় বেশ তো আছি !”

“চিরকাল কি এমনি থাকবে, মা ? আমি কি মরব না ?”

দ্বিতীয় প্রস্তাব

“বালাই ! ওসব কথা বল তো আমি উঠে যাব ।”

বলিয়া চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল । গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন,—

“না—না—বোস্ । একজন যুবক খেতে এলেই তো আর তোকে বে ক’রে নে যাচ্ছে না । তোর মত না হ’লে আমি তোর বে দেব না । তবে কি না এঁরা খুব বড় বংশ, এঁদের অনেক বিষয় । সব তোর নামে লেখা পড়া ক’রে দেবে বলেছে । কথাটা ভাব্‌বার কথা । আমি তো যা, এ পর্যন্ত একটি পয়সা রাখতে পারিনি, হঠাৎ শিক্কে ফুঁকলে তুই দাঁড়াবি কোথা ? আচ্ছা, সে সব কথা পরে । কাল সে তো আসুক, তুই দেখ্ । দু তিন দিন দেখাশোনা ক’রে তোর যদি মত হয়, তবেই কথা ।”

চপলা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল । তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কেবল বাহিরে নয়, বাথার ব্যথী হীনা এই কিশোরীর অন্তরেও । ইহার মা নাই !—হৃদয়ের জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখের জলে গলাইয়া বক্ষে ঢালিয়া দিবে ? দুঃখ যাহার বলিবার কেহ নাই, তাহার দুঃখ বড় দুঃখ ! শান্ত হও দিদি, শান্ত হও । তোমার দাদাভাই আছে । যদি তোর বেদনার অশ্রু মুছাতে না পারি, তবে আমি তোর কিসের দাদাভাই ?

মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী ‘মৌনঃ সন্ন্যতি লক্ষণম্’ বুঝিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আশায় চিঠিখানি দিয়া বলিলেন,—

নকল পাঞ্জাবী

“এই নাও—ডি. পি. চট্টরাজ,—চিঠি” দিয়ে তুমি বাড়ী চলে যেও।”

“যে আজ্ঞে, হুজুর!”

কিন্তু সে দিন যে নাচ দেখে এসেছি! সন্ধ্যার পর আর সে মাতালের কাছে কে যায়? গ্যাঙ্গুলীর নিমন্ত্রণ পত্র মাতাল ডি. পি. চট্টরাজকে না দিয়া আমার ব্যারিষ্টার বন্ধু ডি. পি. চট্টরাজকে দিবার জন্য বলিলাম। আমি বোকা সোকা মানুষ অত কি বুঝি! আর এতে ক্ষতিই বা কি? মাতালের বদলে আমার বন্ধু না হয় নিমন্ত্রণ খেয়ে যাবে।

৮

বন্ধু ব্যারিষ্টারের বাড়ী গিয়া বলিলাম,—

“Line clear (লাইন্ ক্লিয়ার)—তুমি Whistle (হুইসল্) দিয়ে বোরিয়ে পড়।”

সে আমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—

“মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী ষারিক চট্টরাজকে চেনে না—কখনো দেখেনি। কাল সন্ধ্যার পর খাওয়ার অছিলায় চপলার সঙ্গে দেখা শুনা করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আমি অতি বোকা, তাই সে নিমন্ত্রণ পত্র তাকে না দিয়া

তোমাকে আনিয়া দিয়াছি। কাল মাতাল ষ্টারিক প্রসাদ চট্টরাজের স্থলে হতাশ প্রেমিক দ্বিজপদ চট্টরাজ নিমন্ত্রণে যাইবে। গ্যান্‌লী তো তোমাকেও চেনে না।”

বন্ধু বলিল,—

“এ যে False personification !”

“রাখ তোমার False personification ! নিমন্ত্রণ পত্রে এমন কিছু নাই যে, বিশেষ ক’রে ষ্টারিককে বোঝায়। My dear Chattaraj. কাল এসে এখানে ভোজ খেও।’ তুমি এই চট্টরাজ নয় কেন ? তারপর চপলা,—দায়মুদ্রার রাজি তো কি করবে কাজি ? তাকে তোমায় এখন কিছু বলতে হবে না, অবশ্য প্রেমের কথা বলবে বই কি ! কিন্তু দোহাই তোমার Shakespeare বেড়ো না।”

বন্ধুকে নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম,—

“তা ভাই, তোমার যদি মনমত না হয়, তা দাও, আমি নিমন্ত্রণ পত্র সেই মাতাল ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়ে আসি।”

ব্যারিষ্টার হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—

“Arise, black vengeance from the hollow hell !

এখানে black অর্থে সুন্দর, vengeance অর্থে চপলা,

নকল পাঞ্জাবী

আর hell হচ্ছে প্রেম।—হে সুন্দর চপলা আমার, এস এস
প্রণয়ের অন্ধকূপ হ'তে !

বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া বিলাতী অঙ্কুরণে এক
পাক Polka নাচ নাচিয়া আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। আমি
বাড়ী চলিয়া গেলাম।

৯

সারা রাত ভাল নিদ্রা হইল না। গোলমাল, জড়িবুটি
ষতদূর পাকাইতে হয়, পাকাইয়াছে। এক সুন্দরী কিশোরী,
দুই প্রেমিক, অর্থগ্ৰন্থ পিতা, তার পর False personification
fraud, Cheating, breach of trust পিনাল কোড (Penal
Code) ওজড় হয়ে গেছে! এখন পরিণাম কি? পরিণাম
মা-ই জানে, আমি তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে কাজে নেমেছি।

পরদিন আমার দর্শন যাত্রে মিঃ গ্যাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা
করিলেন,—

“চিঠি দিয়েছ?”

“আজ্ঞে হজুর।”

“কোন গোল করনি তো?”

“আজ্ঞে ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়েছি, হজুর!”

তিনি “Right” (রাইট) বলিয়া ব্রীফ পড়িতে লাগিলেন।

অন্য সকাল হইতেই বাজারে ছুটোছুটি, তরকারী

দ্বিতীয় প্রস্তাব

কোটাকুটির ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাংলা, ইংরেজি, মোগলাই, ফরাসী, মগ্ প্রভৃতি সকল জাতীয় খানাই প্রস্তুত হইবে। তার উপর গ্যাঙ্গুলী চপলাকে বলিয়াছেন,—

“ম্যামি, তোমার হাতের পায়েস, সন্দেশ অনেক দিন খাইনি।”—

“উদ্দেশ্য ভাবী জামাতাকে দেখাইবেন, তাঁহার কন্যা কিরূপ রন্ধনপটু। চপলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিয়াছে।

বৈকালে চপলা আমায় বলিল,—

“দাদাভাই, আজ তুমি এখানে খাবে না? এত খাবার তৈরি হচ্ছে। আমি পায়েস রেঁধেছি। বাবা মুখে ঐ রকম বললেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা, আমার রান্নার গুণপনা যার তার কাছে দেখাবেন। ছিঃ, আমার লজ্জা করে! যে সে খাক না থাক, আমার ব'য়ে গেল, কিন্তু তুমি খাবে ব'লে আমি উৎসাহ ক'রে রেঁধেছি। আমি কখনো ভাই-ফোঁটা দিতে পাইনি, ভাইকে আদর ক'রে খাওয়াতে পাইনি! আজ দাদা ভাই, তোমাকে এখানে খেতেই হবে।”

মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিণী করুণাধারা ভগ্নী আমার! আমারও যে সহোদরা নাই! ভগ্নীস্নেহ কেমন জানিনা! আমার চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। বুঝি সে তা দেখতে পেয়েছিল। উৎসুক নেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে

নকল পাঞ্জাবী

রইল। কি অযাচিত স্নেহের সহস্র ধারায় এ আশায় অভিষিক্ত
করছে, শত বন্ধনে আশায় বাঁধছে! আমাকে অনেকক্ষণ
নীরব দেখিয়া সে একটু অভিমানজড়িত কাতর স্বরে বলিল,—

“খাবেনা, দাদাভাই?”

আমিও অতি মুহূ কণ্ঠে বলিলাম,—

“আমার যে মা আছেন, দিদি! আমি তাঁর সঙ্গে না
খেলে, তাঁর খাওয়া হবে না!”

“আমি ভুলে গিয়েছিলুম, দাদাভাই!”

আওয়াজটা ভারী ভারী!

“না দিদি, তুমি অমন ক’রে আশায় তাড়ালে হবে না।
তুমি খাবার দিয়ো, আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে মার কাছে
ব’সে খাব।”

সে হাসিয়া বলিল,—

“আচ্ছা তাই হবে, দাদাভাই!”

সন্ধ্যার পর ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইলেন। চপলা যেন
আকাশ হইতে পড়িল। কিন্তু কিছুই বলিল না। অতি
আদরে, অতি যত্নে অতিথি সংকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ
গ্যাঙ্গুলী মার পর নাই স্তম্ভিত হইলেন।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। ব্যারিষ্টার নিত্যই
অপরান্ত্রে আসে এবং খাওয়া দাওয়া করিয়া বাড়ী যায়। গ্যাঙ্গুলী

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যাহাকে নির্বাচন করিয়াছেন, চপলা যে তাহাকেই মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন কোর্ট হইতে আসিয়া বৃদ্ধ দূর হইতে অলঙ্কিতে দেখিলেন, কণ্ঠা তাঁহার নির্বাচিত জামাতার বক্ষে একটি গোলাপ পরাইয়া দিতেছে। হুহিতার মুখের ভাব দেখিয়াই বৃদ্ধ বিড় বিড় করিয়া ভাবিতে লাগিল,—একদিন আমারও এমনি দিন গিয়াছে! এর সঙ্গে বে হ'লে বোধ হয় ম্যামি সুখী হবে। অর্থ কষ্ট কখনো পাবে না—এঁর টাকা কড়ি বিষয় অনেক। কথা বার্তা চুকাবার এই উপযুক্ত সময়। আজই রাতে।

তারপর চট্টরাজকে বলিলেন,—

“আজ আহারাদির পর তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা আছে।”

এই কথায় আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। সূক্ষ্মসূত্রে যে খড়্গ ঝুলিতেছিল, তাহা পতনোন্মুখ হইয়াছে, আজ রাতে সে নিজে বলি গ্রহণ করিবে। আমি তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া ছুটি লইয়া ছুটিলাম—দ্বারিকায়।

সেখানে পৌঁছিয়াই দেখিলাম, দ্বারিক তখন সুরাসিকুর মাঝখানে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু একেবারে ডুবে নাই। আমি বলিলাম,—

“আপনি করছেন কি? এখন যেতে হবে!”

নকল পাঞ্জাবী

সে কয়েকবার হেলিয়া ছলিয়া সুরা ঢলু ঢলু চক্ষে আঘাত
নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—

“কে বাবা ঘটকালী ? সটকালি বাবা, সটকালি !”

“সটকালি কি ?—এঃ—আপনি সব মাটি করলেন
দেখছি। মিষ্টার গ্যাঙ্গুলীর এখন বেশ ফুর্তির নেশা হয়েছে।
আঘাত বললেন,—লে আও চট্টরাজ, আজই আমি এস্পার কি
ওস্পার করব।”

মাতাল সহসা ভীত হইয়া বলিল, “এস্পার ওস্পার
কি বাবা, খুন করবে না কি ?”

“ক্ষেপেছেন ! জামাই করবে ব’লে নিয়ে গিয়ে খুন !
তা আপনার যদি এত ভয় হয়ে থাকে, আমি চলুম।”

“দাঁড়াও না বাবা ! তোমরা সবাই অমন ক’রে
তাড়াতাড়ি করলে বাঁচব কেন ? একটু ভাবতে দাঁড়াও বাবা !”

“বেশ, আপনি ভাবুন, আর ওদিকে আর একজন
আপনার পিয়ারীকে বে ক’রে বো নিয়ে পালাক !”

“বল কি ! পালাবে ! তবে চল ! উঠাও পালাকী ! কি
বাবা, বাজনা বাজিও সঙ্গে নেব না ?”

“অত দেরী সহবে না। চলুন আমরা রাস্তার মুখে
বাজনা বাজাতে বাজাতে যাব এখন।”

“আলোও নেব না ?”

“আজ্ঞে, আপনিই আলো ক’রে যাবেন, আবার আলো কি ? তা থেকে বরং দু বোতল ছইস্কি নিনু।”

“সাবাস ! সাবাস ! এই—ওরে—বউ আনতে যাচ্ছি, বাজা বাজা ?”

বলিয়া আপনিই মুখে বোল ধরিল,—উব্ব-ব্ব-ব্ব দাদাগো, উব্ব-ব্ব-ব্ব দিদিগো, সোনার প্রতিমেখানি কোথা ফেলে এলে গো।”

আমি মনে মনে বলিলাম,—তথাস্তু । এই বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও বিসর্জন হয় ।

সর্বনাশ করুলে ! পথে আসিতে আসিতে মাতাল চীৎকার করিয়া উঠিল—পেয়েছি, পেয়েছি ! আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি—কি ? মাতাল বলিল,—

“টোপর ! টোপর নইলে যে বে হয় না, বাবা ঘটকালী । বর কনে নইলে চলে, কিন্তু টোপর চাই—চাই-ই চাই !”

বলিয়া রাস্তায় একটা ছোট্ট কেলে হাঁড়ি পড়িয়া ছিল, মাতাল তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিয়া বলিল,— বাজা বাজা রগ্বু বাজা—উব্ব-ব্ব-ব্ব ভেটকী মাছের তিনখানি কাঁটা ;—এমনি করিতে করিতে চলিল । মাঝে মাঝে আশ্রয় বলিতে লাগিল,—“খাম্লে কেন, বাবা ঘটকালী, বাজাও না ! হাত ব্যথা কচ্ছে ?”

যখন মাতালকে লইয়া আমি গ্যাস্কুলীর বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সবে মাত্র আহাৰাদি শেষ হইয়াছে। চপলা তাহার নিজ কক্ষে চলিয়া গিয়াছে। বোধ করি, পিতা পাত্ৰের সহিত গোপনীয় কথা কহিবেন বলিয়াছেন, সেই জন্ত। সিনিয়ার ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টার একখানি গোল টেবিলের দুই দিকে দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছেন। টেবিলের উপর চূৰ্চটের সরঞ্জাম। সিনিয়ার চূৰ্চট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন,—

“I say, Chatteraj—” ঠিক সেই সময়েই কলে হাঁড়ি মাথায় মাতাল উপস্থিত হইয়া বলিল,—

“এই যে বাবা শ্বশুর মশায়! তোমার বর হাজির!— এই, বাজা—বাজা—উব্ব-ব্ব-ব্ব ভেটকী মাছের তিনখানি কাটা—”

তারপর হঠাৎ থামিয়া বলিল,—

“শ্বশুর মশাই, প্রাতঃপেন্নাম!”

শ্বশুর মহাশয়ের হাত হইতে চূৰ্চট অনেকক্ষণ পড়িয়া গিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অতি ধীর অথচ কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে তুমি ?”

মাতাল বলিল,—

“চোখ রাঙ্গাও কেন বাবা ? ভয় করে যে ! চোখ রাঙ্গিয়ে না বাবা, একটু সামলাতে দাও—সারা পথ বাজাতে বাজাতে আসছি। মাল সঙ্গে এনেছি বাবা ! দু পাত্তোর তুমি খাও, এক পাত্তোর আমায় দাও। মাল এনেছি, এই নাও।”

বলিয়া ছইন্ধির বোতল টেবিলের উপর রাখিল।

শুশুর পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে তুমি ?”

“কেন বাবা ? তোমার বর—আমায় চেন না ? আমি বর ডি, পি, চট্টরাজ।”

গ্যাঙ্গুলী ব্যারিষ্টারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তুমি তবে কে ?”

“আজ্ঞে আমি ব্যারিষ্টার ডি, পি, চট্টরাজ।”

মাতাল অমনি চেঁচাইয়া উঠিল,—

“কই বাবা ঘটকালী, সটকালি কেন ? আমার পরিচয় দাও না ! আরে এ ব্যাটাও যে বলে, ডি. পি. চট্টরাজ ! আমি চামে কাঁটা চট্টরাজ, তুই ব্যাটা কি চট্টরাজেরে ? তুই মদ খাস্ ? ব্যাটা বে করতে এসেছ ? শুশুর মশায় ! ও ব্যাটার

নকল পাঞ্জাবী

কথা শুনো না। আমায় বে কর, মুখে থাকবে। ছইস্কি যত চাও, দেব। কথা কওনা যে? কই বাবা ঘটকালী।”

আর ঘটকালী! তখন কামরার পাশে টাঙ্গা গাছের উপর ব্রহ্মদৈত্যরূপে বিরাজমান। সেখান হইতে সব বেশ দেখা যায়, শোনা যায়!

মাতাল আবার চেঁচাইয়া বলিল,—

“বাবা ঘটকালী, এস বাবা। আনিয়ে ভবসাগরে তরী ডুবালে! এই তোমার ধর্ম, বাবা ঘটকালী!—আমায় এনে শ্বশুর সাগরে ফেলে সটকালি? শ্বশুর মশায় তুমি বোকা। এমন কবি জামাইকে বে না ক’রে, মালা দিচ্ছ কিনা ঐ—তুই ব্যাটা কে রে?—সরে পড়না? ছইস্কি খাস্ তো আমার বাড়ী যাস্।—”

গ্যাঙ্গুলী ধমক দিলেন,—

“চোপ্, নিকালো—দূর হও।”

“কেন বাবা, দূর হব কেন? বে করতে এসেছি—নিকালো কেন বাবা? মালা দাও, বাপের স্পুতুর হয়ে স্ড় স্ড় করে চলে যাচ্ছি।”

গ্যাঙ্গুলী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁক দিলেন,

“দরোয়ান!”

“কেন বাবা, আবার দরোয়ান কেন? দরোয়ান বে

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমি করব না! ছিঃ খোট্টা দরোয়ান বে করব! এই বুঝি তোমার মতলব? বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান!—বৌ দেবেনা বাবা? আচ্ছা বাবা, চল্লুম। দেখে নেব—আমি হেঁজি পেজি নই—পয়সা আছে! দাও বাবা, আমার ছইস্কির বোতল ফিরে দাও। মনে করেছিলুম, খণ্ডর জামাই বসে একটু ফুর্তি করব! ফুর্তি করা কি যার তার কাজ! তোমার মতন খণ্ডরকে আমি বে করতে চাইনি। তুই ঐ খোট্টা দরোয়ানকে বে ক'রে ডাল কুটি খা—ছইস্কি খাওয়া কি যার তার কর্ম! আচ্ছা বাবা, চল্লুম—প্রাতঃ পেয়াম।”

বলিয়া, উব্ব-ব্ব দাদাগো, দিদিগো—করিতে করিতে মাতাল নিষ্কাশ হইল।

অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গ্যাঙ্গুলী ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তুমি কে?”

“আমি ব্যারিষ্টার—ডি, পি, চট্টরাজ।”

“তুমি ব্যারিষ্টার, আইন জানো। False personification করেছ, জানো?”

“মশাই, মাপ করবেন। আমি ভদ্রলোক, আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি।”

“তুমি আতিথোর অবমাননা করেছ।”

নকল পাঞ্জাবী

গ্যাঙ্গুলীর স্বর অতি ধীর, কিন্তু ঈষৎ কম্পমান। শুনিতে মনে হয়, যেন অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার বলিল,—

“আমায় মাপ করবেন! এই পত্র আপনার লোক গিয়ে আমায় দিয়েছিল। আমার নাম ডি, পি, চট্টরাজ। আপনি সিনিয়ার ব্যারিষ্টার আমি জুনিয়ার—এক ব্যবসায়ী। আমি আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছি।”

গ্যাঙ্গুলী অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

“আমি বুঝেছি—সেই Stupid Fool এই কাণ্ড করেছে! আমিও Fool, নইলে তাকে জেনে শুনে বিশ্বাস করে ছিলাম!”

সেই সময় চপলা কক্ষ মধ্যে আসিয়া গভীর স্বরে বলিল,

“বাবা!”

কি তেজস্বিনী মহিমাময়ী প্রতিমা! দেখিয়া মনে হইল, ইহার ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, কমলা রাজরাজেশ্বরী একাধারে!—“বাবা!”—গভীর চিন্তামগ্ন গ্যাঙ্গুলী চমকিত হইলেন, কিন্তু ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন,—

“ম্যামি তুমি এখানে কেন?”

“আমি, এখন যাচ্ছি, বাবা! কেবল একটা কথা

তোমায় বলতে এসেছি। ইনি অতিথি, এঁকে অপমান
কোরো না, মনে মনে বিদায় দাও। এঁর তো কোনো
অপরাধ নেই।”

“সত্য।”

“আর বাবা, আমার জন্য তুমি আজ অপমানিত
হয়েছ, তুমি আর আমার বিবাহের কথা মনেও আনিয়ো
না।”

“সে কি ম্যামি ? তার সাধ্য কি আমার অপমান করে ?
আমি সেই অপদার্থের উপর যে রেগেছিলুম, তাই আমার
অনুতাপ হচ্ছে ! আমার পরম লাভ যে বিবাহের পূর্বে ওকে
জানতে পেরেছি। একজন অপাত্র বলে কি আর সৎপাত্র নাই ?
তুই বে করুবি নি কি দুঃখে ?”

“দুঃখ, দুঃখ ! বাবা, আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না !
আমার মা নেই, মা থাকলে বুঝতো।”

আবার সেই মুক্তার প্রশ্রবণ ছুটিল।

বৃদ্ধ সিন্ধু চক্ষে দুহিতার পানে চাহিয়া তাহাকে বক্ষে
টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—

“ম্যামি আমি তোমার দুঃখ বুঝব না ? তুই যে আমার
সব ! কার মুখ চেয়ে তোমার মায়ের শোক ভুলছি ? কার
মুখ চেয়ে বেঁচে আছি ? তোমার দুঃখ আমি বুঝব না !

নকল পাগাবী

ছমাসের কঁড়ি থেকে এই নিশ্চল ফুল আমি কত যত্নে
ফুটিয়েছি ! যখনই তোর সামান্য অসুখ করেছে, দিন রাত
কোথা দিয়ে কেটে গেছে, জানি নি, পাগলের মতো ছুটে
বেড়িয়েছি ! আমি যে তোর বাপ-মা দুই-ই ! কেন আজ
তুই আমায় এমন শক্ত কথা বললি ?”

“ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর ! বড় দুঃখে তোমার মনে
ব্যথা দিয়েছি ! তুমি আর বের কথা তুলো না, আর কখনো
আমার মুখে এমন কথা শুনবে না । কেন বাবা, আমি তো
বলেছিলুম,—মায়ে ছেলে বেশ আছি । এর ভেতর আবার
আর একজন আসে কেন ?”

“আর একজন আশা প্রয়োজন, তাই আসবে । ম্যামি
আমি তোর বাপ, এমন কোনো কথা নেই, যা তুই আমার
কাছে লুকিয়েছিস্ ! আমায় তুই সত্য ক’রে বল, এঁর সঙ্গে
বে হ’লে তুই সুখী হবি কি না ।”

“বাবা, তেমনি স্বপ্ন দেখেছিলুম ! কিন্তু সে রাত্রে
স্বপ্ন জাগলেই ভেঙে যাবে ! ক্রমে তার স্মৃতিও যাবে ।
একটা স্বপ্নের জন্য কর্তব্য কেন ত্যাগ করব ? আমি না
দেখলে, তোমায় দেখবে কে ?”

“না, ম্যামি, তা হবে না । কর্তব্য কেবল তোরই ?
আমার কিছু নেই ? আজ বাদে কাল তোর এই বুড়ো ছেলে

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তোকে ফেলে কোথায় চলে যাবে ! তাকে আর খুঁজেও
পাবিনি ! তোকে চিরজীবনের জন্য অকুলে ভাসিয়ে যাব ?
তোমায় সুখী করা কি আমার কর্তব্য নয়, ম্যামি ?”

“আমি অসুখী কিসে বাবা ?”

“অসুখী নও, কিন্তু অসুখী হবে ।”

“কেন বাবা, বললুম তো রাত্রে স্বপ্ন ঘুম ভাঙলেই
ভেঙ্গে যাবে ।”

“না মা, তা ভাঙে না । তুমি যখন ছ মাসের, তখন
একদিন হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ! কিন্তু মা,
কই, আজও তো তার ঘোর কাটেনি ! না ম্যামি, তা হয় না ।
স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে, ভাঙে না ।”

তারপর যেন আপন মনে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন,—

“আজ আমার চোখের উপর থেকে একটা পর্দা উঠে
গেছে । অর্থ আর খুঁজ্ব না—গরীব, একান্ত গরীবকে মেয়ে
দেব । তাকে আমি মানুষ করব ।”

একটু স্থির থাকিয়া ব্যারিষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

“তোমার কি আছে ?”

সর্বনাশ ! Shakespeare ঝাড়ে বুঝি ! না—বিচ্ছেদ
আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে ভায়ার কবিত্বও বোধ করি ছুটেছে ।

বন্ধু বলিল,—

নকল পাঞ্জাবী

“আজ্ঞে, আমার বলতে কেবল আমিই আছি, আর উন্নতির বাসনা আছে।”

“তার জন্ম আমি দায়ী। যুবক, তোমায় অপমানের কথা বলেছি—ভুলে যাও। Forget and forgive. আমি তোমার সঙ্গে অণ্যায় ব্যবহার করেছি, তার দণ্ডস্বরূপ আমার এই কন্যাকে তোমায় দিলুম। আমার পুত্র নেই, বৃদ্ধ হয়েছি, তুমি যদি এসে আমার গৃহে পুত্রের স্থান অধিকার কর, আমি সুখী হব। সে Fool, জীবনে অন্ততঃ একবার ঠিক ভুল করেছে। তার উপর আর আমার রাগ নেই। ম্যামি, আজ তোর মা থাকলে কি আনন্দ! বৃদ্ধ চক্ষু মুছিলেন।

এখানে আর আমাকে প্রয়োজন কি? আমার কার্য শেষ! আন্তে আন্তে টাঁপা গাছ হইতে নামিয়া চোরের ন্যায় চম্পট দিলাম।

তৃতীয় প্রস্তাব

“মধুরেণ সমাপয়েৎ”

১

আজ ব্রাহ্মবিহীয়া । বাংলা দেশে জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি যত কিছু উৎসব অনুষ্ঠান আছে, এই ব্রাহ্ম বিহীয়া—সহোদরের অর্চনা সর্বশ্রেষ্ঠ । পাঞ্জাব আমার এত প্রিয় হইলেও শুধু আজ এই একটি দিনের জন্ত আমার মন সেই প্রেম-ভক্তি-করণার ত্রিধারায় ধৌত ভূমির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে । মনে হয়, আমার ভাই ভগ্নী নাই, কিন্তু সেখানে সপ্তকোটি সহোদর সহোদরা আমার জন্ত স্নেহের বাহু প্রসারণ করিয়া আছে । মনে হয়, সেই স্নেহ-পাশে আপনাকে ধরা দিবার জন্ত ছুটিয়া যাই !

চপলার মুখে সেই দু’দিনের জন্ত ‘দাদাভাই’ সম্ভাষণ শুনিয়া সহোদরা স্নেহ কি, উগভোগ করিয়াছি ।

“দাদাভাই !”

পূর্ব স্মৃতির প্রতিধ্বনির মত মধুর কণ্ঠে সেই মধুর সম্ভাষণ সহসা আমার কানে এবং প্রাণে আসিয়া বাজিল—“দাদাভাই !”

তাড়াতাড়ি কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই চপলা উপস্থিত । বলিল,—

নকল পাঞ্জাবী

“দাদাভাই, আজ ভাই ফোঁটা । আমি ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি ।”

আমার চক্ষু দিয়া দুই চারিটা মোটা মোটা গোটা গোটা ফোঁটা বারিয়া গেল । আমি বলিলাম,—

“কই দাও !”

চপলা বলিল,—

“ওমা ! ওকি !—আসনে বস্বে চল—তবে তো ফোঁটা দেব ।”

আমি তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া বারান্দায় গিয়া দেখি, একখানি আসন পাতা, আর তার সম্মুখে ভাই ফোঁটার উপচার । আমি সেই আসনে গিয়া বসিলাম ।

তারপর ষখন সে পবিত্রভাবে সম্মিত মুখে ছল ছল নেত্রে ফোঁটা দিতে দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল—

‘ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা

ষমের দোরে পড়ল কাঁটা ।’

আমার সত্যই মনে হইল, আমি মৃত্যুঞ্জয় হইলাম । সেই সময় কক্ষমধ্যে মঙ্গল-শব্দ ধ্বনিত হইল । আমি বলিলাম,—

“দিদি, এইবার খাই ?”

চপলা বলিল,—

“ওমা ! তুমি কোন্ আকালের দেশ থেকে আসছ, দাদাভাই ?”

তৃতীয় প্রস্তাব

আকাল ! স্নেহের এই পরিপূর্ণ ভাঙারের দেশে
আকাল ! বলিলাম,—

“তুমি যে বললে দিদি, ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি ?”

দিদি হো-হো-হো—সেই তেমনি হাসি—আরও মধুর,
স্নেহমাখা হাসি হাসিয়া বলিল,—

“ফোঁটা দিতে এসেছি, বলেছি ; খেতে তো বলিনি !
আগে রসো, আর একজন ফোঁটা দিক । আমি যাই, শাঁকটা
বাজাইগে ।”

চপলা চলিয়া গেল । তারপর আর একটি কিশোরী ধীর
পদবিক্ষেপে গজেন্দ্র গমনে আমার সম্মুখে আসিয়া—একে !—
বেলা !—সেই চঞ্চলা বেলা !—সে এমন ধীর স্থির হইয়াছে !

চপলার মত বেলাও তেমনি ভাবে তেমনি মন্ত্র পড়িতে
পড়িতে আমায় ফোঁটা দিল । শাঁকটা বাজাইয়াই আমাদের
কাছে আসিল । আসিয়া তার সেই হাসি হাসিয়া বেলার গালে
অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—

“দাদাভাই, ইয়া আসুলি রং কি নকলি ?”

হা-হা-হা-হা-হা—বেলা ও চপলা হাসিয়া উঠিল ।

আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম । বলিলাম,—

“বেলা, তুমি এখানে ?”

চপলা বলিল,—

নকল পাঞ্জাবী

“বেলা কি বিল্লী বল ।”

বেলা বলিল,—

প্যারী শঙ্কর বাবুকে দেখতে এসেছি ।”

এ পোড়ারমুখীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করে কে?
মা গেল কোথায়? মা আজ আমায় এই দুই রান্ধুসীর হাতে
সঁপে দিয়ে অস্তর্ধান হয়েছেন। এমন সময় বাহিরে ডাক
পড়িল,—

“মুখ রাজ !”

বাঁচা গেল। ঠাকুরদার গলা। আমি বাহিরে যাইবার
জন্ত উঠিতেছি, এমন সময় ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে
ঠাকুরদা ভিতরে আসিলেন। মা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া
ঐহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরদা আমাদের নিকটে আসিয়া
বলিলেন,—

“সব ফোঁটা দাদাভাইকে দিয়েছিস? এখটা বুঝি
বুড়োর জন্তে রাখতে নাই!”

চপলা বলিল,—

“তোমায় ফোঁটা দেব কেন দাদামুণি? দুই বোনে
তোমার গলায় মালা দেব। তার পর দুই সতীনে তোমাকে
নিয়ে খুব ঝগড়া করুব।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

তৃতীয় প্রস্তাব

“দিদি, এমন দিন ছিল, যে তোদের মতন দশটা সতীনকে
মুঠোর ভেতর রাখতে পারতুম !”

চপলা বলিল,—

“দাদা ভাই, এইবার খাও ।”

বেলা বলিল,—

“দাদা ভাই ও সব কি খাবে !”

ওঁ খাবে (মূহু মূহু গাহিয়া)

“মোট মোটি ডাল রোট ছোট ছোট চানা ।”

আমি বলিলাম,—

বেলা দিদি, মাকে তোমার গান শোনাতে হবে ।”

দুষ্টা বেলা বলিল,—

“অংরেজি বোলতা হেঁ, নেই বাংলা বোলতে হেঁ ? হামু
ভি খোড়া খোড়া অংরেজি জানতা । গান মানে—কামান্ ।”

আবার তেমনি হাসি । এ দুষ্টাদের অঁটিয়া উঠা আমার
কর্ম নয় । বলিলাম,—

“তোমরা দুজনে আজ পরামর্শ ক’রে আমায় জালাতন
করতে এসেছ ।”

বেলা বলিল,—

“না । তোমার দুই বোঁ আর তিন লেড়কী দেখতে
এসেছি । কই দেখাও, নইলে ছাড়ব না ।”

নকল পাঞ্জাবী

দাদা মশাই বলিলেন,—

“ভায়া জান তো, ছেলেবেলা তোমার মার আবদার তোমায় বলেছি—ছাড়্‌ব না। বেলারও আবদার ছাড়্‌ব না। ও যখন ধরেছে, তোমার বৌ দেখবে, তখন না দেখে ছাড়্‌ব না।”

আমি বলিলাম,—

“তা হলে ঠাকুরদা বাংলা দেশের কুমোরের দোকান থেকে একটা আল্লাদী পুতুল কিনে আন্‌তে হয়।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“কুমোরের দোকান কেন, দাদা? আর কিন্তেই বা যাব কেন? আমি একটি সন্ধান ব'লে দিচ্ছি, সেখানে গেলেই পুতুল পাবে। তবে আল্লাদী নয় ভাই—পুতুল—নয়নপুতুলী। মা, শোনো, আমার ছেলের একটি বাল্যবন্ধু আছে, কলিকাতায় একজন বড় চাকুরে। তার একটি মেয়ে আছে,—পরমাসুন্দরী। মা আমার বেলাকে আর চপলাকে মনে মনে এক ক'রে দেখ, তাহলেই তাকে কতকটা বুঝতে পারবে। মেয়েটি সেয়ানা হয়েছে।”

মা বলিলেন,—

“বেশ তো বাবা, তুমি সব ঠিক ঠাক ক'রে দাও।”

আমি বলিলাম,—

তৃতীয় প্রস্তার

ঠিক ঠাক কি মা ! ষার বে তার মনে নেই, পাড়া
পড়শীর ঘুম নেই !”

মা বলিলেন,—

“তুই আমায় কথা দিয়েছিস্, জানিস্ !”

আমি বলিলাম,—

“সে সৎপাত্র হ’লে ।”

বেলা বলিল,—

“তুমি সৎপাত্র নও কেমন করে ? নিজের মুখেই তো
বলেছ—তোমার তলাও আছে, গৌ আছে, বিদে আছে ।
নৌ টান্‌তা, গৌ পাল্‌তা হাঁয়—তুমি আবার সৎপাত্র নও !”

আমি চুপ করিয়া রহিলাম । আপনার জালে আপনি
বদ্ধ হইয়াছি । ঠাকুরদা বলিলেন,—

“ঘটকালিতে তোমার হাত খুব পেকেছে দাদা । এবার
কেমন ঘটকালি কর, দেখ্‌ব । শোনো, আমায় বড় ধরেছে ।
তোমার মেয়ে পছন্দ না হয়, তুমিও খালাস, আমিও খালাস ।”

মা বলিলেন,—

“খালাস নয়, বাবা ! খোকার বে দিয়ে তবে তোমার
নিশ্চিন্তি ।”

ঠাকুর দা হাসিয়া বলিলেন,—

“মা, ঘটকালিতে তোমার খোকার যে রকম গুণপনা,

নকল পাঞ্জাবী

ভাতে আর আমাদের বড় কিছু করতে হবে না। ভায়া, শোনো, আমি এখনি কাশীতে টেলিগ্রাম করে দি আর কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দি মেয়ের বাপের কাছে। তুমি মেয়ে দেখে এস।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কাশীতে কেন, বাবা ;”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মেয়েটি এখন কাশীতে আছে, তার দাদার কাছে। বিশেষরের মাথায় কেবল ফুল বিলপত্র চড়াচ্ছে, তোমার খোকাকে বর কামনা ক’রে।”

আমি বলিলাম,—

“ঠাকুর দা, আমার কথা সে জানলে কেমন ক’রে ?”

“ভায়া, এ সব সন্ধান দেবার লোক আছে। সে কথা সে-ই এসে তোমায় বলবে। যাই, আমি এখনি টেলিগ্রাম ক’রে দি।”

বলিয়া বেলা ও চপলাকে লইয়া ঠাকুর দা চলিয়া গেলেন।

আমি মনে মনে বুঝিলাম, আমাকে জঙ্গ করিবার জগুই বেলা ও চপলা মিলিত হইয়াছে। এদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে। আমার মা আছে, দুই বোন পেয়েছি, ঠাকুর দা আছেন, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই, আমার কি চাই! আমাকে ভাবিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কবে কাশীতে যাবি, বল ?”

আমি বলিলাম,—

“আমি কাশী যাবি না, কলিকাতায় যাব ।”

মনে মনে ইচ্ছা—একটা গোলমাল হইয়া সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায় । মা বলিলেন,—

“মেয়ে রইল কাশীতে, তুই যাবি কলিকাতায় ?”

“মা, বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালায় বসে না দেখলে দেখাই হবে না ।”

মা বলিলেন,—

“যা ভাল বুঝিস্, কর বাবু ! কাশীতে রইল মেয়ে, তুই কলিকাতায় গিয়ে কাকে দেখ্ বি ?”

“কেন মা, আমি কলিকাতায় যাচ্ছি ব’লে কাশীতে তার ভাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম ক’রে দেব ।”

“তবে তার বাপকেও একখানা টেলিগ্রাম করিস্ ।”

“তার দরকার কি ?”

“সে কি রে ! তাদের কি একটা অভ্রমে ফেল্ বি ?”

“আচ্ছা, সে যা ভাল হয়, কর্বে । মা আমি কালই যাব ।”

“দিন নেই, ক্ষণ নেই, কালই যাবি কি !”

“আগে তো মেয়ে দেখে আসি মা । তার পর ফিরে এসে দিন ক্ষণ দেখা যাবে ।

নকল পাঞ্জাবী

“যা ইচ্ছে কর বাপু! এবার কিন্তু বৌ ঘরে আনতে হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।”

এই রে! মেয়েটা যেমন সেই ছেলেবেলায় ঠাকুরদার কাছে আবদার ক’রতো, আমার কাছেও তেমনি আরম্ভ ক’রেছে!

২

এই প্রকারে বাঙ্গালী মেয়েটাকে পছন্দ করিতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। সঙ্গী—আমিই আমার সঙ্গী। এ সব কাষে সঙ্গী লওয়া সুবিধার নয়। আর সঙ্গীই বা কে আছে? সুতরাং একাই যাত্রা করিলাম। যাত্রাকালে মা আশীর্বাদ করিলেন। কি যেন বিড়বিড় করিয়া ঠোট নাড়িয়া বলিলেন। বোধ হয়, প্রজাপতি ঠাকুরের কাছে কচি পাঠা মানত করিলেন। পরে বলিলেন,—

“কালীঘাটে মাকে দর্শন করিস্। আসবার সময় কিছু প্রসাদ নিয়ে আসবি। গিয়েই টেলিগ্রাম করবি। দেখিস্, কোন গোলমাল করিস্ নি। এই পাঞ্জাবী পোষাক পরে’ বুঝি তাদের বাড়ী যাবি! বল্লুম্ শুন্লি না, ধৃতিচাদর পর। তা’না, ছাত্তুর পোষাক। যা’ হয় কর, বাপু। ট্রেন হতে নামবার সময়ই পোষাক বদলাস্, বুঝ্‌লি?”

তৃতীয় প্রস্তাব

“বুঝেছি, এর মধ্যে না বোঝবার কিছুই নেই। আর সময় নেই।”

মার পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা করিলাম। যতদূর দেখা যায়, মা জানালায় দাঁড়িয়ে আমায় দেখিতে লাগিলেন—ছেলে দিগ্বিজয়ে যাইতেছে! এ আনন্দের মধ্যেও যেন একটু বিষাদের কালিমা! নয়নমণি নয়নাস্তুরাল হইলে, মা বোধ হয় অশ্রু মুছিয়া জানালা বন্ধ করিলেন। কঠিন ডালকুটির প্রাণ, আমার চক্ষেও জল আসিল! প্রাণটা কেমন ওলুটি পালুটি করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, না, কার্য নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই—মায়ের কোলে ফিরিয়া যাই। কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই। যা থাকে কপালে,—রণক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলাম।

ঝাঁপ করিয়া একখানা সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট কিনিয়া একেবারে প্লাটফর্মে আসিয়া গৌফে এক তা দিয়া দাঁড়াইলাম। এতগুলো টাকার মায়া গৌফে তা'য় সারিবে কেন? অন্তায়, অন্তায়,—ইন্টার-ক্লাসের একখানা কিনিলেই ত হইত! হঠকারিতায় কি আহাম্মকিই করিলাম। প্রাণটা দমিয়া গেল। কিন্তু কেন যেন দমা-প্রাণটায় আমার অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা সুখের কাঁপুনিও ফুকানিয়া উঠিতেছিল। হউক না ভাবী—তবু ত খুশরবাড়ী বটে। এই যা ভরসা। ভাবীতেই এত সুখ!

নকল পাঞ্জাবী

আহা, বর্তমানে না জানি সে কেমন ! মধুর কল্পনার প্রাণটা আবার তাজা হইয়া উঠিল । ব্যাগটা খুলিয়া একপোঁচ গোলাপী খোস্বাই-আতর গোঁফে মাখিয়া লইলাম । স্ফূর্তির হিড়িকে একটু বেশী আতর গোঁফে লাগিয়া গেল । আর যায় কোথায়, —একেবারে ধূমহীন দাবানল ! বিষম জলুনি আরম্ভ হইল । জ্বিত দিয়া খানিকক্ষণ ঠোঁটখানা চাটলাম । জ্বিতটা তেতো হইয়া গেল । এমনি সময় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল । হাত-বিছানা ও ব্যাগটা বগলে ও হাতে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম । উঠিতে গিয়া পাগড়ীটা আঁনালার মাথায় লাগিয়া পড়িয়া গেল । হায়, কি কুক্ষণেই যাত্রা করিয়াছি ! কে জানে, ললাটে আরও কত কি আছে !

শূন্য কামরা ; আমিই একমাত্র আরোহী । যাহা হউক, পয়সার সুখ হইল । গাড়ী ছাড়িয়া দিল । আহা কি মধুর বাঁশরীর সুর ।—“ইষ্টাশন কদম্বমূলে গাড়ী ~~ধু~~ বাজায় বাঁশী ।”

যৌবন কাল, তা’তে আবার কার্য্যকারণের যোগাযোগ । সে সুরে কত কথাই মনে হইতে লাগিল । পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম । কত কি দেখিলাম, কত কি ভাবিলাম ! বার শত মাইল এখনও বাকী !—বাকালী মেয়েটা যদি কালো হয়—ঠোঁটদুটো যদি লাল না হয় !—এমনি রসের নাগরদোলায়

ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে অতি বেগে ছুটিয়া চলিলাম।



তালগাছের আড়াই হাত। আর চারিশত মাইল মাত্র বাকী। কিন্তু এই চারিশত মাইল আমার কাছে একটা দীর্ঘ-জীবনের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে গাড়ী বিখ্যাত মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া ইঁপ ছাড়িল। আর একটু বাকিলেই ঈশ্বর কাশী দর্শন হয়, কিন্তু বেটার অদৃষ্টে তা নাই। দূর হইতেই কাশীনাথের উদ্দেশে নমস্কার করিলাম। তার পর কিছু জলযোগ করিয়া শরীর মন শীতল করিলাম।

গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব নাই, এমন সময় দুইটি বাঙ্গালী-মহিলা, একটা ছিপ্‌ছিপে, সোণার-চশমাপরিহিত যুবককে সঙ্গে করিয়া আমার শূন্য-গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। ছুটাছুটি, হৈচৈ, বাঙ্ক-ব্যাগ দমাদম্—একটা বিরাট্ কাণ্ড করিয়া কোনরূপে গুছাইয়া বসিলেন। বসিতে না বসিতেই অল্পবয়স্কা মহিলাটি অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

“সর্বনাশ হয়েছে! বৌদি! খাবারের চাকারী! মেজদা, খাবারের চাকারীটা দেখছি না যে, ওয়েটিং-রুমে পড়ে আছে বুঝি? যেটাড়াতাড়ি কল্লে!”

নকল পাঞ্জাবী

“তাই তো ”

বলিয়া তাহার মেজদা নামিয়া পড়িলেন । মেয়েটি উদ্ভিগ্ন হইয়া মেজদাকে ডাকিলেন,—

“এস, কাষ নেই, গাড়ী এখনি ছেড়ে দেবে । যেয়ো না, খাবারে কাষ নেই—”

“নিয়ে আস্ছি ।”

বলিয়াই সেই মেজদা দ্রুত গতিতে ওয়েটিং-রুমের অভিমুখে ছুটিলেন ।

“কি হবে, বৌদি ? গাড়ী যদি ছেড়ে দেয়, কি হবে ! কেন আমি ছাই খাবারের চাকারীর কথা বল্লুম ! এস, আমরা নেমে পড়ি ।”

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই আমার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল । আমি গম্ভীর হইয়া পা-দু’টা তুলিয়া পাঞ্জাবী-চংএ বসিয়া টাইম-টেবেলখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম ;—এমন উদাসীন ভাব, যেন আমি তাদের কথাবার্তা, কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারি নাই । নেয়েটা আমায় তদবস্থ দেখিয়া একটু বোধ হয়, আশ্চর্য হইল—বেটা হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নয়, ওর কাছে আর ভদ্রতা অভদ্রতা লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের ?

বৌদি জানালায় মুখ বাড়াইয়া মেজদার আগমন-প্রতীক্ষায় সোৎকণ্ঠে প্লাট্‌ফর্মের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । দেখিতে

তৃতীয় প্রস্তাব

দেখিতে গাড়ী নড়িয়া উঠিল। নড়িয়াই গতি-বিশিষ্ট হইল। কিন্তু মেজদা কৈ? মেয়ে দু'টি-আকুলি বিকুলি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিবার সাধ্য নাই। আমিও জানালায় মুখ বাড়াইয়া দিলাম।—ঐ যে, ঐ যে,—থাবারের চাকারী হাতে মেজদা ছুটিয়া আসিতেছেন। আর একটু, আর একটু—গাড়ী সাঁ। করিয়া বাহির হইয়া গেল। মেজদা প্লাটফর্মে পড়িয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, থাবারের চাকারী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া, মেজদা বসিয়া পড়িয়াছেন। তারপর আর দেখা গেল না। একমেঘ কাল ধোঁয়া আসিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মেজদাকে আমাদের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিল।

মহিলা-দুইটি হায় হায় করিয়া আকুলি-বিকুলি কাঁদিতে লাগিলেন। কি করিব, গম্ভীর হইয়া সব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভারী ব্যথিত হইলাম। আমার মুখের দিকে তাঁহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি করণ, কি মর্শ্বস্পর্শী! জীবনে এমন আর দেখি নাই, দেখিতেও যেন না হয়। সে কাতর দৃষ্টির প্রশ্ন—আমি কোন সাহায্য করিতে পারি কি না। পারি, খুব পারি! বেদনার সঙ্গে আনন্দের একটা সূক্ষ্ম সুরে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, হৃদয়টা কি ভয়ানক! কারো সুখ, কারো দুঃখ।

নকল পাঞ্জাবী

মনে মনে বলিলাম, আমি আছি, তোমাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু বলিলে কি হইবে, দুঃখে যে সুখ অনুভব করে, তাকেই তো ভয় ! আমিই তাঁদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ হইলাম। আমাকে নির্বিকার, নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা আরও ভড়কিয়া গেলেন। ভাবিলাম, আর নয়, আর একটু বিলম্ব হইলে তাঁহারা শিকল টানিবেন। তখন আমি যে ভালমানুষ, কিছুতেই প্রমাণ হইবে না। আমার এই ছদ্মবেশই অপরাধের প্রধান সাক্ষী হইবে—আমিই আমার বিভীষণ হইব। মনে মনে বলিলাম, “ওগো, আমি তোমাদের জন্ম এ বিপদে জীবন-পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত।”

কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অস্তুরের ভাষা মাতৃভাষায়ই বাহির হয়, সুতরাং কিছুই বলিতে পারিলাম না। এই পোষাকে এতক্ষণ পরে বাংলা বলিলে, হিতে বিপরীতই হইবে। কি করি, যা থাকে কপালে, হিন্দীতেই আরম্ভ করি। কি জানি, তাঁরা আমার মনের কথা বুঝিলেন কি না। বোধ হয় কিছু বুঝিয়াছিলেন, কেন না এ সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণই পটু।

ভগবান রক্ষা করিলেন ! প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইলাম। তাঁরাই প্রথম মুখ খুলিলেন। কনিষ্ঠা মহিলাটি—কিশোরী, কি যুবতী, কি মাঝামাঝি ;—না কিশোরীই, কেন না কুমারী—আমায় সম্বোধন করিয়া পরিষ্কার হিন্দীতে বলিলেন,—

তৃতীয় প্রস্তাব

“জী, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে যদি একটু উপকার করেন! আমরা বড়ই অসহায়, বিপদগ্রস্ত।”

আমি চোখ খুলিয়া তাঁহার মুখে চাহিলাম। হিন্দীতেই উত্তর দিলাম,—

“আমি আপনাদের এই বিপদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। আমি প্রাণপণে আপনাদের সাহায্য করুব। আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গী থাকুব, ততক্ষণ আপনাদের কোন ভয় নাই, জানবেন।”

মহিলা দুইটির ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁরা যেন আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন—একটা শাস্তি-সূচক খাটো নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কিশোরী সাগ্রহে বলিলেন,—

“আপনি কোথায় নাববেন?”

“আমি কলিকাতায় যাইতেছি।”

“আমরাও কলিকাতায় যাব। তবে ত আপনি বরাবরই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।”

“আজ্ঞে হাঁ, আমি আর কোথাও নাব্ব না।”

বালিকার মত সরল-ব্যাকুলভাবে গর্দগদ হইয়া তিনি আবার বলিলেন,—

নকল পাঞ্জাবী

“না, কোথাও নাববেন না। আমরা বড় অসহায়, বড় বিপদে পড়েছি, আমাদের আপনি ছেড়ে যাবেন না।”

“আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি থাকতে কোন ভয় নাই। আপনারা বড় ভয় পেয়েছেন। একটু শাস্ত হ'ন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা যার সঙ্গে আসছেন, তাঁর নামটি কি?”

“তিনি আমার মেজদাদা, তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।”

“পরের ষ্টেশনেই তাঁর নামে তার করব। বোধ হয় আমরাও তাঁর তার পাব।—হাঁ, আপনারা কোথেকে আসছেন?”

“কাশী থেকে।”

কাশীর নাম শুনে মনে যেন কেমন একটু ক্ষুণ্ণতা বোধ হইল। স্মরণে কাশীর প্রসঙ্গটা আরও না চালাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—

“আপনারা তা হ'লে কাশীতে থাকেন?”

“কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে। পূজোর সময় মা বাবা সকলেই কাশীতে বেড়াতে এসেছিলেন; সম্প্রতি তাঁরা কলিকাতায় ফিরে গেছেন। কলিকাতায় আমাদের আসল বাড়ী; কাশীতে আমি, আর ইনি—আমার বৌদিদি, বড়দাদা,

তৃতীয় প্রস্তাব

এবং মেজদাদা থাকি। বড়দাদা বাবার সঙ্গেই কলিকাতা গেছেন।”

“আপনারা কি এখন তবে কলিকাতায়ই থাকবেন? আর কানী আসবেন না?”

“আসব বই কি, তবে কবে আসব, ঠিক নেই।”

আমার জেরায় অল্প সময় হয় তো ইহারা চটিয়া আগুন হইতেন। কিন্তু স্থানকালপাত্র তাহা হইতে দিল না। বরং দেখিলাম, আমার এই আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নে তাঁহারা যেন খুসীই হইয়াছেন! ইহাতে আমার স্বার্থ ছাড়া অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল, তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া লওয়া, এবং কথায় কথায় তাঁদের অন্তমনস্ক রাখা।

“আপনারা যে কলিকাতায় যাচ্ছেন, আপনার বাবা কি তা জানেন?”

“জানেন বই কি, তিনিই তো আমাদের যেতে টেলিগ্রাম করেছেন।”

“আপনারা এই ট্রেনেই যাচ্ছেন, তা কি তিনি জানেন?”

কিশোরী যেন জিজ্ঞাসু হইয়া অর্ধ-অবগুষ্ঠিতার দিকে চাহিলেন। বলিলেন,—“বৌদি, মেজদাদা নিশ্চয়ই বাবাকে টেলিগ্রাম করেছেন, না? তুমি জান কি?”

বৌদি একটু ভাবিয়া বলিলেন,—

নকল পাণ্ডাবী

“না ভাই, আমি তো তা’ জানি নে।”

কিশোরী তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

“না জী, তা আমরা ঠিক জানি না। আপনি দয়া ক’রে বাবার কাছেও একটা তার করে দেবেন।”

“নিশ্চয়ই দেব, দেব ব’লেই ও কথা জানতে চেয়েছিলুম।”

আপনার দয়া আমরা জীবনে ভুলব না।”

আমি একটু শ্রাকামি-ধরণে বলিলাম,—

“না, না, সে কি বলছেন? এ আর দয়া কি! আপনার বাবার নামটি কি, বলুন তো?”

পিতার নাম শুনিয়া আমি একেবারে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। এ কি শুনি! এ যে আমার ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের নাম: কানী, কলিকাতা, শ্বশুরের নামে নাম—তবে কি?—আমার বুকটা দুৰুদুরু করিয়া উঠিল; মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল। জানি না, সে বাঙ্গালা না হিন্দী। আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

হঠাৎ কিশোরী আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিলেন,—

“আপনি কি বাবাকে চেনেন?”

টোক গিলিয়া কোনমতে বলিলাম, “না, তাঁকে দেখি নাই, তবে তাঁর নাম শুনেছি। জানি না, তিনি কি না।

তৃতীয় প্রস্তাব

আচ্ছা, তিনি কি কিছুদিন আগে একবার লাহোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?”

“লাহোরে ? হ্যাঁ, তিনি কিছুদিন হ'ল লাহোরে গিয়েছিলেন। আপনি কি করে জানলেন ?”

মুষ্কিলে পড়িলাম। তিনি না বলিলেই চুকিয়া যাইত। এখন যদি ধরা পড়ি ! আর পড়িলামই বা, কতি কি ?—না, তা হবে না। আনন্দে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার আর সন্দেহ হইল না—ইনিই আমার ‘তিনি’ হইবেন ? তাই যদি হয়, তাহলে এমন সুন্দর, এমন সরল,—আমি বড় ভাগ্যবান। ঠাকুরদা ঠিকই বলিয়াছেন !

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, “কেমন, চিনেছেন কি ?”

“হ্যাঁ, চিনেছি।”

আমার কথায় তাঁর মুখে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আমি সে সুন্দর মুখের সে সুন্দর ভাবটুকু উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনিমেষদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আর কিছুই মনে রহিল না। আমি বাহাকে দেখিতে যাইতেছি, এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব—এমন সুন্দর নিঃসঙ্কোচ ভাবে।

সব ভুলিলাম, ইচ্ছা হইল তার সুন্দর গুত্র, নিটোল

নকল পাঞ্জাবী

কোমল হাতখানি ধরে বলি,—‘আমি তোমাকেই দেখতে
যাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখতে পেয়েছি।’

মনের কথা মনেই রইল, বলা হইল না। বলিলাম না
যে, ভালই করিলাম। বলিলে হয় তো একটা বিষম কাণ্ড
ঘটিয়া যাইত। হয় তো তাঁহারা আমায় ছোঁচোর ঠাওরাইয়াই
বসিতেন। বৌদি শিকল টানিয়া আমার শিকল পরার
বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তবে এমন উচ্ছ্বাসটা একেবারে
মাটি হইতে দিলাম না। অন্য আকারে তাহাকে রহিয়া
সহিয়া প্রচার করিতে বসিয়া গেলাম। বলিলাম,—

“আপনারা তবে আমার আত্মীয়। আপনারাও
আমায় আত্মীয় ভাববেন, পর ভাববেন না।”

এতক্ষণে বৌদির মুখে কথা ফুটিল। একটু কক্কণ অধচ
স্মিতহাস্তে ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন,—

“আপনিও আমাদের পর ভাববেন না ভাগ্যে আপনার
সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নইলে—ইত্যাদি।”

অতঃপর উভয়পক্ষ কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। গত
বিপদ গত হইল, শুধু ভবিষ্যতের জন্য একটা স্মৃতি রাখিয়া
সরিয়া পড়িল। এমনি সময়েই গাড়ী বক্সার ষ্টেশনে আসিয়া
ইাঁপ ছাড়িল। আমার নবীনা বন্ধুটি বলিলেন,—

“তবে আপনি এবার টেলিগ্রাম করে আসুন,—ছইখানা।

তৃতীয় প্রস্তাব

একখানা কলকাতায়, আর একখানা মেজদার কাছে, মোগল-সরাই । আহা, মেজদা কত না ভাবছেন, হায়, হায় করছেন !”

বৌদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

“আমার কাছে তো টাকা নেই, তোমার কাছে আছে কি ?”

টাকার প্রশ্ন উঠিতে না উঠিতেই আমি সটান্ নামিয়া ষ্টেশনঘরে ঢুকিলাম । মোগলসরাই ষ্টেশনে আমার ভাবী মধুর-কুটুম্বের নামে তার করিলাম ।—‘তুমি পরের গাড়ীতে চলে এস, কোন ভয় নাই । গাড়ীতে আমাদের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে । তিনি সব ঠিকঠাক করে দেবেন । আমরা তাঁর সঙ্গে কলিকাতা চলিলাম ।”

কলিকাতায় তার করিলাম না । এখন আমিই কর্তা । তাঁদের আর উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হইল না ।

ঘণ্টা পড়িল আমি দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম । আমার বন্ধু গাড়ীর দরজার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কোন দিকে খেয়াল নাই । একটা আধা-সাহেব শিষ দিতে দিতে পাষচারি করিতেছিল ; আমায় গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল ।

একটু হাঁপ ছাড়িয়া বসিলাম । বন্ধু বলিলেন,—

“আপনাকে কত কষ্ট দিলাম ! আপনি ঠিক বলেছিলেন,

নকল পাঞ্জাবী

এই দেখুন মেজদা তার করেছেন! আপনি যখন টেলিগ্রাম করতে যান, তখন ষ্টেশনের এক পিওন এসে দিয়ে গেল। আমার নাম ধরে ডাকছিল শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। তারপর দেখি টেলিগ্রাম, এই দেখুন।”

এই বলিয়া টেলিগ্রামখানা আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—

“আপনিই পড়ুন না।” বলিতেই বন্ধু একটু স্থিতহাস্তে মলজ্বকণ্ঠে পাঠ করিলেন। একে তো ইংরেজী, তাতে আবার টেলিগ্রাম। বুঝিলাম আমার বন্ধু কালে আমাকেও ইংরেজী-বিদ্যায় ছাড়াইয়া যাইবেন। একটা সময়ে, আত্মগৌরবে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। আমাদের দাম্পত্যলীলায় বুদ্ধিরও একটা অঙ্ক থাকিবে। বন্ধুকে বলিলাম,—

“আপনি কি কলেজে পড়েন?”

“না, অতদূর যেতে পারি নি, স্কুলের পড়া শেষ করেছি মাত্র।”

“আর পড়বেন না?”

“না, আর পড়া হবে না।”

“কেন?”

বন্ধু মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৌ-দিদি যুহু যুহু হাসিতে লাগিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব

কেন হবে না সে কথা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম।
ছ'দিন পরেই বিবাহ—আর পুঁথি পড়ার অবসর ও সুবিধা,
কোথায়? এখন অণ্ড পড়া—বোঝাপড়া।

বন্ধু বলিলেন,—

“মেজদাকে পরের গাড়ীতে আসতে বলেছেন তো?”

“হাঁ, তিনি পরের গাড়ীতেই আসবেন। হাঁ, আপনার
বাবাকে আর তার করি নি। আপনারা যাচ্ছেন—জানেন,
কিন্তু এ বিপদের কথা শুনলে, তিনি ভারী উদ্ভিগ্ন হ'য়ে
পড়বেন।”

বন্ধু একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—

“না, তার না করলে আরও উদ্ভিগ্ন হবেন।”

“কি করে? আপনাদের এই ঘটনার কথা কি ক'রে
জানবেন?”

“মেজদা এতক্ষণে জানিয়েছেন।”

শেষে বোকা বনিয়া গেলাম একটি বালিকার কাছে!
কর্তৃত্ব করিতে গিয়া কি আহাম্মকি করিলাম। মনে মনে
নাকে-কাণে খত্ দিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম,—ভবিষ্যতে
আর কখন এমন কর্তৃত্ব করিব না।

কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম,—

“তাই তো, ও কথা আমি বুঝতে পারি নাই। এই

নকল পাঞ্জাবী .

দেখুন, বাঙ্গালীতে আর পাঞ্জাবীতে কত প্রভেদ । আজ আপনার কাছে একটা কিছু শিক্ষা করলুম ।”

বৌদি যেন স্বগতঃ বলিলেন,—

“পুরুষমাত্রেই এমন বোকা, সে বাঙ্গালীই কি, আর পাঞ্জাবীই কি । পাঞ্জাবীরা সেটা স্বীকার করে, কিন্তু বেহায়া বাঙ্গালী-পুরুষগুলো সেটা স্বীকার করা দূরে থাকুক, উন্টে নির্বুদ্ধিতাকে ধমকে ঢাকতে চায় ।”

বৌদির বাঙ্গালী-বিদ্বেষটা আমার মন্দ লাগিল না । অবশ্য এ ইতিহাসের মূলে একটা মধুর কলহ বর্তমান । যা’ হোক, আমি আরও একটু ঝাকা সাজিয়া বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম,—

“আমাকে কিছু বলছেন না কি ?”

বৌদি যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “না—না—আমি বলছিলুম টেলিগ্রাম নাই বা করলেন ।”

স্ত্রী-চরিত্র বুঝা ভার । বলিলাম,—

“তা হয় না, আমি পরের ষ্টেশনেই টেলিগ্রাম করব ।”
বন্ধু একটু হুঃখিত হইয়াই যেন বলিলেন,—

“দেখুন, আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই, আপনি—”

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—

তৃতীয় প্রস্তাব

“বেশ তো, না হয় আমার কাছে এর জন্ত ঋণীই
রইলেন। আমি আপনাদের আত্মীয়, আমার উপর এখন
আপনাদের সম্পূর্ণ ভার, সুতরাং আপনাদের কোন ওজর
আপত্তি আমি শুনছি না, কোনরূপ সঙ্কোচ আমি গ্রাহ্য
করব না।”

বন্ধু হাসিলেন। বলিলেন, “ক্ষমা করুন, আমি আর
কিছু বলব না।”

বৌদিদি কিন্তু ছাড়িলেন না। বন্ধুর চেয়ে বয়সও বেশী,
সংসারটা দেখাশুনাও কতকটা হইয়াছে। সুতরাং অমন এক
কথায় তুষ্ট করিবার ও তুষ্ট হইবার মত মন এখন তাঁহার নাই।
বলিলেন,—

“আপনি আমাদের অসময়ের বন্ধু, আপনার এ দয়া
জীবনে ভুলব না।—আত্মীয়? আপনি আত্মীয়ের চেয়েও
বেশী।”

বন্ধুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। কি যেন বলিতে
তাঁর হৃদয় চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। আমি তাঁকে
দেখিতেছিলাম। আমারও চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল।
বন্ধু আধার মুখে সরল, শাস্তদৃষ্টি স্থাপন করিয়া যুত্বরে
বলিলেন,—

“আপনি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলেন,

নকল পাঞ্জাবী

নইলে ভগবান এ বিপদে আপনাকে আমাদের কাছে পাঠাবেন কেন ?”

আমি নয়ন নত করিলাম, মনে মনে আনন্দের হাসি হাসিলাম। মনে মনেই বলিলাম—হাঁ ছিলাম বই কি, খুবই ছিলাম। পূর্বজন্মে যা ছিলাম, এবারও তাই হ’তে এসেছি। প্রকাশে বলিলাম,—

“আমারও তাই মনে হয়। আপনাদের দেখেই যেন মনে হ’ল, যেন কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি যেন আপনারা আমার কত কালের, কতদিনের আত্মীয় !”

বৌদি বলিলেন,—

“আমাদের তা হ’লে মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না।”

বন্ধু বলিলেন,—

“হাঁ, আমাদের ভুলবেন না, মনে রাখবেন।”

“আশা করি, আপনারাও আমায় ভুলবেন না।”

বন্ধু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—

“আপনি যে বাঙ্গালী নন, সে কথা আমাদের মোটেই মনে ছিল না। আপনি যখন আমাদেরই একজন। তাই ত, আপনি যদি বাঙ্গালী হতেন !”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—

“যদি হতেন তবে কি হ’ত ?”

তৃতীয় প্রস্তাব

বৌদি অগ্ৰদিকে মুখ করিয়া ছুঁচামির হাসি হাসিয়া বন্ধুর আঁচলে একটি সূক্ষ্ম টান করিয়া বাংলায় বলিলেন,—

“বাঙ্গালী হলে আমাদের এই আদরিণীকে দান করুতেম।”

বন্ধু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

“যাও ! উনি যদি বাঙ্গালা বোঝেন ?”

“বুঝেনই বা, বেশ তো ! পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালী—
বেশ মানাবে।”

সৰ্বনাশ ! আবার সেই Intermarriage আসে যে !

“বৌদি, তুমি বড় অসভ্য। যাও, চুপ কর, ছিঃ !”

আমি যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই—এমনি ভাল মানুষটির মত গম্ভীর হইয়া ক্রমাৎ মুখ-দাড়ি মুছিতে লাগিলাম। অবশ্য, এই মোছার একটা উদ্দেশ্য ছিল। অধরের ছুঁচ-হাসি কি জানি যদি দাড়ি ভেদ করিয়া প্রকাশ পায় ! সাবধানের মা'র নাই। মনে মনে দাড়িকে ধন্যবাদ করিলাম। বৌদি আমায় নিতান্ত উদাসীন দেখিয়া বন্ধুর অমূলক সন্দেহে মোটেই বিশ্বাস করিলেন না। চাপা হাসি আরও চাপিয়া বলিলেন,—

“কেন, দাড়িকে তোর এত ভয় কেন ? পাঞ্জাবীরা তো এমনিই দাড়ি রাখে। তোর যদি ভাল না লাগে, বিয়ের পর নাপিত ডেকে ফেলে দিবি। কিন্তু যা বল ভাই, আমার

নকল পাঞ্জাবী

কিন্তু ওকে পাঞ্জাবী বলে মোটেই মনে হয় না। দেখছ না, কেমন ফুটফুটে রং, লম্বা ছিপছিপে চেহারা,—দাড়িটা যেন আটা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। কে জানে, পাঞ্জাবী না আর কিছু!”

শুনিয়া আমার গা জলিয়া গেল। আমি ভেতো বাঙ্গালী! অকৃতজ্ঞ,—এই তোমাদের ব্যবহার! আমাকে সন্দেহ! আচ্ছা দাঁড়াও, এর প্রতিশোধ লইতেছি। স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে, অচিরেই এক একটা গোলোকধাঁধা হইয়া দাঁড়ায়, কোন বিষয়ই বিশ্বাস করিতে রাজি হয় না।

কিন্তু যাই বালি, মনটা একটু দমিয়া গেল। বন্ধু বলিলেন,—

“ওদের ওতেই সুন্দর দেখায়।”

“বটে, এটবার ঘটকালিটা করি! যাক, ওঁর পরিচয়টা আমাদের জানা দরকার, উনি আমাদের এত করুলেন।”

“না, আমি পারব না, তুমি জিজ্ঞাসা কর।”

“কেন, লজ্জা কিসের, এ তো আমাদের কর্তব্য। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তখন ত কিছুই বলতে পারব না। আর একটা কথা, উনি পাঞ্জাবী, অবশ্য লাহোরের সংবাদ রাখেন। কি বলিস্, হেম?”

“যাও।”

হেম কৃত্রিম কটাক্ষে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিল। বৌদি স্তব্ধা পাইলেন; বলিলেন,—

“হয় তো আমাদের লাহোরের বন্ধুটির কোন খবরও জানতে পারেন।”

হেঁম রাগিয়া বলিলেন,—

আর বন্ধুতে কাষ নেই!”

“কেন, একজন পেয়েছিষ্ বুঝি?”

“দেখ বৌদি—”

“আমি তো তাই দেখছি!”

“তুমি বড্ড বেহায়া মেয়ে—তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি পারব না।”

“তবে এত রাগ কেন?”

বলিয়া বৌদি আমার দিকে ফিরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। হেমের পিতার নামে তার করিলাম,—“কাল ভোরে হাওড়ায় পৌছিব, আমরা গাড়ীতে বেশ নির্বিঘ্নে আসছি।”

আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। আর অধিক আলাপ করিতে সাহস হইল না। বিশেষতঃ যে প্রসঙ্গটা ইতঃপূর্বেই উত্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল, সেটা আমার নিতান্ত কচিকর হইলেও, বাধ্য হইয়া তাহার হস্ত এড়াইবার অন্য উদ্দিগ হইয়া উঠিলাম,—ব্যাগ হইতে একখানা ইংরেজি বই বাহির করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম।

নকল পাঞ্জাবী

আমায় ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহারা একটু দমিয়া গেলেন। আর সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ততটা সাহস করিলেন না। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচলাম।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গাড়ীতে আলো জ্বলিল। তখন বই বন্ধ করিয়া একবার বাহিরের সন্ধ্যা-প্রকৃতির শোভা দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। অস্তুরের পরিপূর্ণতায় সমস্ত প্রকৃতি পরিপূর্ণ দেখিলাম। ভিতরে বাহিরে আজ আমার আনন্দের উৎসব। আমার সঙ্গিনীদ্বয়ও আমারই মত চূপ্‌চাপ্‌ বসিয়া সন্ধ্যা-প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। দিনের সুরের সঙ্গে রাত্রির সুর—কেন যেন বেসুরা বাজিতে লাগিল। মনটা কেন যেন অজ্ঞাত একটা বেদনায় ছট্‌ফট করিয়া উঠিল! হেমের মুখের দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ চাহি নাই, চাহিয়া দেখি নাই, তাই বুঝি এত ছট্‌ফটানি। দুঃখের ঔষধ চিনিয়া লইলাম। আমি চাহিতেই হেমও আমার দিকে চাহিলেন। সন্ধ্যাচটা প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম,—

“এইবার কিছু খাবারের যোগাড় দেখি, কি বলেন?”

তৃতীয় প্রস্তাব

“তাই তো, আপনার বড় ক্ষিদে পেয়েছে!”

“শুধু আমার কেন, আপনাদেরও কি পেতে নাই? তা’
সত্যি, আমার ক্ষিদে কিছু পেয়েছে বই কি।”

বৌদি ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন,—

“পরের ষ্টেশন হইতে কিছু খাবার লওয়া যাবে!”

বলিয়াই বৌদি বেতের একটা বাক্স খুলিয়া কয়েকখানা
জাম্বাণ-সিলভারের বাসন ও দুই তিনটা গ্লাস বাহির করিলেন।
হেম জলের কুঁজো হইতে জল ঢালিয়া বাসনগুলি ধুইয়া লইলেন।
পরবর্তী ষ্টেশনের অপেক্ষায় মোৎসুক হইয়া রহিলাম।

ষ্টেশন হইতে কিছু ফল রুটি ও মিষ্টি কিনিয়া আনিলাম।
পর্যাপ্ত পরিমাণেই কিনিলাম। আমার এই নূতন-জীবনে
গৃহের আভাস-প্রাপ্ত হইলাম।

হেম আমার হাত হইতে সব গ্রহণ করিলেন এবং
বলিলেন,—

“আপনি বসিয়া যান।”

হেম বৌদির সহযোগে প্লেট পূর্ণ করিয়া আমাকে রুটি
দিলেন। আমি টপাটপ্ দু’খানি সাবাড় করিলাম। অতঃপর আর
একখানা। ভাবিলাম, আর না, আর খাইলে, আমাকে নিশ্চয়ই
এরা অসভ্য ভাববে। সুতরাং অনিচ্ছা-সঙ্গেও বলিতে হইল,—

“না, আর না, সব খেলে আপনারা কি খাবেন?”

মকল পাঞ্জাবী

হেম হাসিয়া ফেলিল, বলিল, “না—না সে কি, এই মিষ্টিটা নিন।” বলিয়াই আমার হাতের উপর ধীরে ধীরে দিল। দিয়াই আবার বলিল,—

“আর একটা?”

“আর খেলে মরে যাব।”

মনে মনে বলিলাম, মিষ্টি দেবার জন্ত এত তাড়াতাড়ি কেন? ভবিষ্যতে তো দীর্ঘ জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। কত মিষ্টি দিতে পার, বুঝ্‌ব।

হেম বলিল, “মিষ্টি খাওয়া বুঝি আপনাদের পাঞ্জাবীদের অভ্যাস নেই?”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—

“বান্ধালীরা খুব মিষ্টি খায়।” হঠাৎ বৌদি বলিলেন,—
“আপনিও ত বান্ধালী।” বলিয়াই কথাটা সারিয়া লইলেন—
“যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন।”

আমরা সকলেই হাসিলাম।

জলযোগান্তে লম্বা হইয়া পড়িলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। মনে হইল, যেন আমি আজ বাসরে শুইয়া আছি। কিন্তু তখনই গাড়ী বংশীধ্বনি করিল। বুঝিলাম, এ বাসর নয়, চলন্ত ট্রেনেই শুইয়া আছি। হটক ট্রেন, এ ট্রেনই আমার বাসর,— বাসরের চেয়েও বেশী। হেমকে এখন যা পছন্দ করিলে হয়—

তৃতীয় প্রস্তাব

আমি কি বোকা! মাকে মা বলিলেই তো তাঁহার হৃদয়ে
প্রবেশ করিবার প্রশস্ত পথ।

৫

ভোর হইল, পথেরও শেষ হইল, আমার সাধের বাসর
ভাঙিল!

দিনের আলো চোখে পড়িতেই চৈতন্য হইল। যে জাল
পায়ে জড়াইয়াছি, এখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব কি করিয়া।

ভাব্ছি—ভাব্ছি—কত কি ছাইভস্ম! কখনও
আকাশে উঠিতেছি, কখনও চিৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িতেছি,
কখনও ডিগ্বাজি কখনও হাবুডুবু।

না—যখন আসিয়াছি, ফেরা হইবে না। হেমের বাবার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই যাইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ও দিব।
একটা সন্ধ্যা আসিয়া আমার অন্তর চাপিয়া ধরিল। না,
আজ আর যাব না। আজিকার দিনটা কোন হোটেলের থাকিব।
আগামী কল্য গৌফ নিদেন দাড়ীটা কামিয়ে বাঙ্গালী হইয়া
গিয়া দেখা করিব। হাঁ, তাই ঠিক। নইলে আর বাঁচিবার
অন্য পথ নাই। বেহুঁস্ হইয়া ভাবিতেছিলাম, তখন আমার
কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ হেমের কথায় চমকিয়া
উঠিয়া দেখি, গাড়ী হাওড়া প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নকল পাঞ্জাবী

আমার মুখের ভাব দেখিয়া হেম ভারী উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। বলিল,—

“আপনার তো কোনো অসুখ করে নি?”

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়াই দরজা খুলিয়া প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম। হেম ও বৌদিকে বলিলাম,—

“আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাড়ী ঠিক করে নিচ্ছি।” গাড়ী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একজন ষাঙ্গালী বাবু গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, ইনিই আমার ভাবী সম্বন্ধীবাবু। আমি ফিরিয়া আসিতেই হেম বলিল,—

“ইনি—ওঁর জন্মেই আমরা এ বিপদে রক্ষা পেয়েছি।”

হেমের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। আমাকে বলিল,—

“ইনিই আমার বড়দাদা।”

আমি বড়দাকে নমস্কার করিলাম। তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন। এবার হিন্দি ও ইংরেজী মিশাইয়া আমাকে সম্বোধন এবং আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—

“আপনি আমার ভাই—ভাইয়ের ‘চেয়েও বেশী।’” বলিয়াই আমার করমর্দন করিলেন।

আমি বলিলাম,—

আমায় যখন ভাই বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আশা করি,

তৃতীয় প্রস্তাব

আমায় আর কোনরূপ ধন্যবাদাদি দিয়া লজ্জিত করিবেন না। যদি করেন, তবে বুঝ্‌ব, আপনি মুখেই কেবল ভাই বলিতেছেন, অন্তরে গ্রহণ করেন নাই।”

আমার কথায় শালাবাবু তার বুকের মধ্যে আমায় টানিয়া লইলেন।

অনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হইল। হেম ও বৌদি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমি আমার হাতব্যাগ হাতে ও বিছানাটুকু বগলে করিতেই, বড়দা আমার হাত ধরিলেন,—

“দিন, আমাকে একটা দিন।”

আমি তাঁহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম,—

“এইবার তবে বিদায় দিন।”

“সে কি! চলুন আমাদের বাড়ীতে।”

“যাব—যাব বই কি, নিশ্চয়ই যাব। তবে এখন যাপ করবেন। আমাকে এখনই গিয়ে এক ভুল্ললোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন, এই গাড়ীতেই আমি যাব।”

“না—না—না সে হবে না। আগে আমাদের বাড়ী, তার পর সেখানে।”

“যদি এখনই না যাই, তবে হয় তো তাঁরা একটা কাণ্ড করে বসবেন। হয় তো লাহোরে টেলিগ্রাম করে বসবেন।

নকল পাঞ্জাবী

মা সে টেলিগ্রাম পেলে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আমি বিকালে আপনাদের বাড়ী যাব।”

“আপনাকে না নিয়ে গেলে বাবা আমার উপর ভারী অসন্তুষ্ট হবেন।”

“আপনি তাঁকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে, তিনি কিছু বলবেন না। আপনার বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন।”

“সত্যিই এখন আসবেন না?”

“যদি সাধ্য থাকত তো এই মুহূর্তেই যেতুম।”

“ঠিক বলুন, কখন যাবেন?”

“বিকালে।”

“আপনার ঠিকানা বলুন, আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।”

মহা বিপদে পড়িলাম। ভাবিলাম একটা যা' তা' ঠিকানা বলিয়া দিই। কিন্তু মিথ্যা ঢের বলিয়াছি, আর বলিতে সাহস করিলাম না। বলিলাম—

“আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি বিকালেই যাব।”

“ঠিক? আমাদের বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

“আমি তা জানি। আমি আপনার ভগ্নীর নিকট হ'তে

তৃতীয় প্রস্তাব

জেনেছি, আপনাদের টেলিগ্রাম করতে দরকার হয়েছিল।—
তবে এখন আসি। হ্যাঁ, আপনার পুরো-নামটি কি, বলুন
তো?”

“শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।”

পকেট হইতে নোটবহি বাহির করিয়া লিখিয়া লইলাম।
লিখিলাম, “শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমার বড় শ্যালক)।”

বড়দা ক্ষুণ্ণমনে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমায় তাঁহার
সঙ্গে না দেখিয়া হেম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ও দাদার সঙ্গে
কি যেন কথাবার্তা হইল। আমি দেখিলাম, হেম মাথা নাড়িয়া
যেন কোন কথা প্রতিবাদ করিল। করিয়াই দ্রুত আমার
দিকে আসিতে লাগিল! আমি হেমকে যেন দেখিয়াও দেখি-
লাম না। ধীরে যাত্রা করিলাম। হেমও একেবারে আমার
সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অভিমানভরা মুখে মুহূর্তমাত্র চাহিল।
সব বুঝিলাম। হেম আমাকে নিতে এসেছে। সে কম্পিতকণ্ঠে
বলিল, “কোথায় যাচ্ছেন জী চলুন আমাদের বাড়ী। আপনি
যদি না যান, তবে আমরাও যাব না।”

আমি ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি
বলিব, কি করিতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু কতক্ষণ
এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলে! আমার নকলত্ব বিসর্জন
দিলাম। বলিলাম, “আমি বাঙ্গালী। আমায় যদি ক্ষমা করেন,

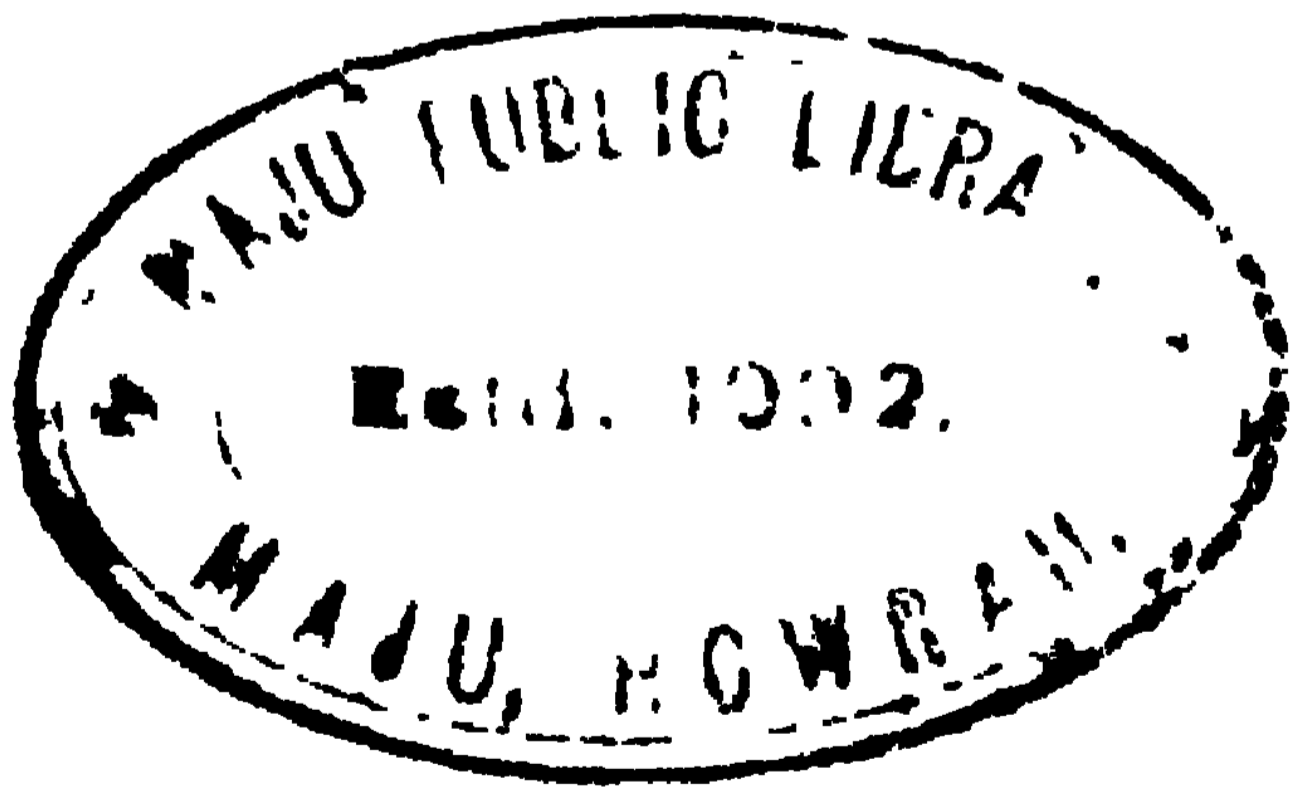
নকল পাঞ্জাবী

তবে ষাব, নইলে ষাব না ।—আমি তোমাকেই দেখতে এসে-
ছিলুম, ভগবান তোমায় আমাকে দেখায়েছেন । তবে আমি
আসি ? আর তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আসতে বল, তবে
আবার আসব ।”

হেম খরখর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; মুখ লাল হইয়া
গেছে । মাথা নীচু করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ।

হেমের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল । কম্পিতকণ্ঠে বলিল,
“এসো,—তোমায় আসতেই হবে ।”

আনন্দে আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল । হেম তাড়া-
তাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিল । আমিও ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া
পড়িলাম ।



আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

যুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে “ছয়-পেনি-সংস্করণ”—“পাত-পেনি-সংস্করণ” প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্বে প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্ততম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে : সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লক্ষপ্রতিষ্ঠ কীর্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্বে প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, ‘অভাগী’ ও ‘পল্লীসমাজের’ এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্মপাল, বড়বাড়ী ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎ-প্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবর্তী হইয়াছে। “ক্লেশঃ ফলেন হি পুন নর্বাভাং বিধত্তে।” শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সহস্র-শ্রী-কার্যে রিপণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে
এরূপ সুন্দর সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্বপ্রথম প্রবর্তক।
আমরা অসুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাতেই আট-
আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই
'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী
করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে,
সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্বসাধারণের সহানু-
ভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্যে
হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিলে আমা-
দিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার
বহন করিতে হইবে না।

এই সিরিজের—

প্রকাশিত হইয়াছে—

- ১। অভাগী (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
- ২। ধর্মপাল (২য় সং) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ
- ৩। পল্লী-সমাজ (তৃতীয় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৪। কাঞ্চনমালা (ছাপা নাই) মহামহোপাধ্যায়
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

- ୫। ବିବାହବିପ୍ଳବ ଶ୍ରୀକେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଏମ୍, ଏ, ବି, ଏଲ
 ୬। ଛିଦ୍ରାଲି ଶ୍ରୀସୁଧୀକ୍ଷୁନାଥ ଠାକୁର ବି, ଏଲ
 ୭। ଦୁର୍ଘାଦଳ ଶ୍ରୀସତୀକ୍ଷୁମୋହନ ସେନ ଗୁପ୍ତ
 ୮। ଶାସ୍ତ୍ରତ ଭିକ୍ଷାସି ଶ୍ରୀରାଧାକମଳ ଯୁକ୍ତୋପାଧ୍ୟାୟ
 ଏମ୍ ଏ, ପି, ଆର, ଏସ
 ୯। ବଡ଼ବାଡ଼ୀ (ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ) ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନଧର ସେନ
 ୧୦। ଅରକ୍ଷଣୀୟା (ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ) ଶ୍ରୀଶରତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
 ୧୧। ଯଜୁର୍ଘ ଶ୍ରୀରାଧାଲଦାସ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ୍, ଏ
 ୧୨। ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶ୍ରୀବିପିନଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ
 ୧୩। କ୍ରମେର ବାଲାଇ ଶ୍ରୀହରିମାଧନ ଯୁକ୍ତୋପାଧ୍ୟାୟ
 ୧୪। ଯୋଗାର ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀମରୋଜ୍ଞରଞ୍ଜନ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଏମ୍, ଏ
 ୧୫। ଲାହିକା ଶ୍ରୀମତୀ ହେମନାମିନୀ ଦେବୀ
 ୧୬। ଆଲେକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଦେବୀ
 ୧୭। ବେଗମ୍ ସମରକ୍ତ ଶ୍ରୀବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ
 ୧୮। ନକଲ ପାଞ୍ଚାବୀ ଶ୍ରୀଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ
 ୧୯। ବିପ୍ଳବଦଳ ଶ୍ରୀସତୀକ୍ଷୁମୋହନ ସେନ ଗୁପ୍ତ

ଶୁକ୍ରଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ ସମ୍ପାଦକ

୨୦୧, କର୍ମଓୟାଲିସ୍ ଟ୍ରିଟ୍, କଲିକାତା

প্রিয়জনকে উপহার দিবার

কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

ধিন্দুর ছেনে	১।।০	শিশুত মশাই	১।০
ধিরাজ ব	১।০	শ্রীকান্ত	১।০
প্রিনীতা	১।০	দেবদাস	১।০
মেজদিদি	১।০	কাশীনাথ (যন্ত্র)	
বুড়দিদি	১।০	চন্দ্রনাথ	
বৈকুণ্ঠের উইল	১।০	শিক্ষিত	
মিলন মন্দির	১।।০	দিদি	
ধিনিময়	১।।০	অন্নপূর্ণার মন্দির	
বিদেশিনী	১।০	অষ্টক	
পোষাপুত্র	১।০	রূপের সূলা	
মন্ত্রশক্তি	১।।০	রঙ্গমহাল	
মহানিশা	১।০	কঙ্কণচোর	
জ্যোতিঃহর	১।।	মেজ'বউ	
বাণী	১।০	গৌশমন্দির	
কল্যাণী	১।০	বিষয়	
কুললক্ষী	১।০	ক - কুণ্ডলা	
সাবিত্রী	১।।০	কুম্বকান্তের	
শৈব্যা	১।।০	উইল	
শর্মিষ্ঠা	১।০	আশালতা	
সীতাদেবী	১।০	ভ্রমর	
		বেদিনী	

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট কলিকতা

